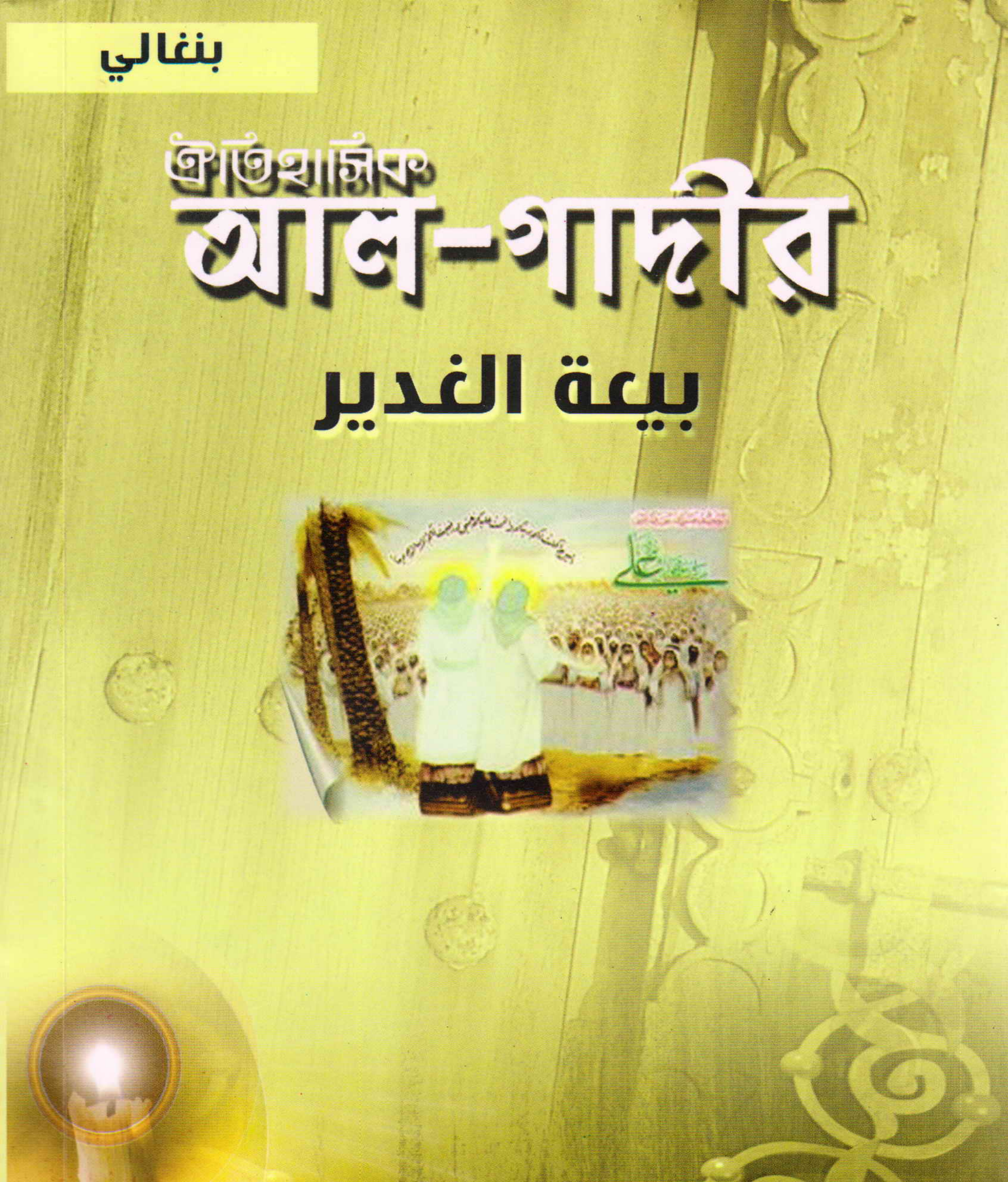


بنغالي

ঐতিহাসিক

আল-গাদীর

بيعة الغدير

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ মীর রেজা হুসাইন শহীদ

ঐতিহাসিক
আল-গাদীর

সংকলনে ও সম্পাদনায়

ক্বারী মীর রেজা হুসাইন শহীদ

(এম.এম. হাদীস, এম.এফ. হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম)



প্রকাশনায়

অধ্যয়ন পরিষদ বাংলাদেশ

আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

ঐতিহাসিক আল-গাদীর

সংকলনে ও সম্পাদনায়

ক্বারী মীর রেজা হুসাইন শহীদ

(এম.এম. হাদীস, এম.এফ. হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম)

প্রকাশকাল

২১ রমজান ১৪২৪ হিজরী

১৭ নভেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

৩ অগ্রহায়ন ১৪১০ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ

জা'ফারী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স

২৮ নুতন আরামবাগ, বক্স কালভার্ট রোড

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন- 011-022429

মুদ্রণে

মিতা প্রেস

আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

সৌজন্য মূল্য

১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

জা'ফারী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ঃ ২৮ নুতন আরামবাগ

বক্স কালভার্ট রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন- ০১১-০২২৪২৯।

দারুল কোরআন লাইব্রেরী ঃ হোসাইনী দালান, ঢাকা-১১১২।

ভূঁইয়া প্রকাশনী ঃ ৩৮/১ বাংলা বাজার ও বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

এছাড়াও বাংলাদেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমুহে।

OITIHASHIK AL-GADIR (HISTORICAL AL-GADIR) : BY MOULANA MIR REZA HOSSAIN SHAHID AND PUBLISHED BY ADHAYN PARISHAD BANGLADESH, ARAMBAG, MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH.

PRICE : 100 (One Hundred) TAKA ONLY. ■ $: 2.00 Dollar

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন জনাব সাইয়েদ রাশেদ হুসাইন জায়দী ইমাম-ই জুম'আ ও জামাআত হুসাইনী দালান ইমাম বাড়া, ঢাকা-এর

অভিমত

ঐতিহাসিক মহান গাদীর বিষয়ে একটি বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি- আল হামদুলিল্লাহ।

জ্বিলহজ্জ হিজরী সনের দ্বাদশ মাস বা সমাপনী মাস এবং এটি সেই মাস, যে মাসের ১৮ তারিখে বিদায় হজ্জের অব্যবহিত পরেই মহান রাব্বুল আলামিনের ঐশী নির্দেশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়াসাল্লাম গাদীরে খুম নামক স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত 'আলী ('আঃ)-এর বিলায়েত ঘোষণা করেছেন- ঘোষণা করেছেন তাঁকে আমাদের মাওলা হিসেবে এবং বায়াতের মাধ্যমে অভিষেক প্রক্রিয়াও সুসম্পন্ন করেছেন। মানব জাতির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ বিষয়ে অজ্ঞতাও চরম পর্যায়ে- এই অজ্ঞতাকে দূর করতে প্রয়োজন ব্যাপক লেখনির। এই ঐতিহাসিক গাদীর বিষটির উপর বাংলা ভাষায় তেমন কোন বই-পুস্তক নেই বললেই চলে।

তাই এই বিষয়ে মীর রেজা হুসাইন শহীদ-এর গবেষণা মূলক সংকলনে কিছুটা হলেও পাঠক সুধী সমাজের ওষ্ঠাগত ঈমানের তৃষ্ণা নিবারনে কিছুটা সহায়ক হবে বলে আশা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দ্বীন ও মাযহাবের খেদমত করার আরো তাওফিক দান করুন। আমীন!

সাইয়েদ রাশেদ হুসাইন জায়দী

উৎসর্গ

মরহুম আল্লামা আবদুল হুসাইন আহমদ
আল আমীনী আন-নাজাফী-কে

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ কথা

সমস্ত প্রসংশা নিখিল স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। যিনি মানব জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে যুগে যুগে তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে সর্বশেষে নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করে পরিসমাপ্ত করেছেন নবুয়াত ও রেসালতের ধারাবাহিকতা এবং মনোনয়নের ধারা অব্যাহত রেখে মানুষকে হিদায়েতের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বেলায়েত তথা ইমামতের পথকে করেছেন উন্মুক্ত।

দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি– যাঁরা জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামকে প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের কাজ চালিয়ে গেছেন নিরলস ভাবে।

আর যেই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন ইমামত তথা বেলায়েতের সুমহান স্রোত ধারা। সেই ধারাবাহিকতার প্রথম ইমামের ইমামতের আনুষ্ঠানিকতা খোদা তাঁর প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিয়ে কিভাবে সম্পাদন করেছেন তারই একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে অত্র **ঐতিহাসিক আল-গাদীর** গ্রন্থে।

সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, মুসলমানরা যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তাদের অবস্থা হলো রাখালহীন মেষপাল আর কান্ডারী বিহীন তরণীর মতো। যে যেদিক থেকে পারছে তাড়া করছে, যেদিকে খুশি সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে হায়েনারা আক্রমণ চালিয়ে তাঁদেরকে শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত করেই রাখেনি বরং তাদের কালো থাবার গহ্বরের মধ্যে রেখে যখন তখন যেভাবে সেভাবে ব্যবহার করছে।

কারোর-ই এ কথা অজানা নয়, যে কোন মতবাদেরই প্রণেতা নিজেই তাঁর নেতৃত্বের আসনটি পূর্ণ করার নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের খুব ভালোভাবে জানা আছে যে, তারা যে ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী সে মতাদর্শটি হলো মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত মতবাদ। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবেই এ ধর্মের নেতাও হতে হবে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত।

কিন্তু মুসলমানরা যেন সে কথাটি বেমালুম ভুলেই গেছে। অথচ তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যতো নবী-রাসূলই পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত নেতা। তাঁদের কেউ-ই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব দান করেন নি। শুধু তাই নয় এ সকল নবী-রাসূলগণের স্থলাভিষিক্ত যাঁরা হয়েছেন, তাঁরাও সকলেই ছিলেন মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত। আর জনগণ কর্তৃক মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে সূরা আন'আমের ১১৬ নং আয়াতে তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আমরা যদি নিজেদের বিবেককে কিছুটা প্রসারিত করি তাহলে আমাদের বিবেকই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে যে, এ পৃথিবী কখনো আল্লাহ্‌র মনোনীত নেতা বা হেদায়েতকারী শূণ্য ছিল না এবং থাকতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া যখন পৃথিবীতে একমাত্র মানব যুগল, তখনো তাঁদের দু'জনের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত পথ প্রদর্শক-নেতা। তাহলে বর্তমান বিশ্বে যেখানে কোটি কোটি মানুষ জীবন যাপন করছে, তাদের সঠিক নেতৃত্ব দানের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত কোন পথ-প্রদর্শনকারী নেতা থাকবে না বা প্রয়োজন হবে না কোন যুক্তিতে? অথচ মহান আল্লাহ নিজেই বলেন-

انما انت منذر ولكل قوم هاد

অর্থাৎ (হে নবী)! নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তুমি লোকদের ভয় প্রদর্শনকারী। আর প্রত্যেকটি জাতির জন্যেই রয়েছে (আল্লাহর) মনোনীত হেদায়েতকারী। (সূরা রাদের ৭নং আয়াত)

অপরদিকে কারো পক্ষেই অস্বীকার করার জো নেই যে, মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের বিকল্প নেই। আর সমাজ জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নেতৃত্বের বিষয়টি। এ বিষয়টি যদি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক মীমাংসিত না হয়ে থাকে তাহলে "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা"– এ কথা বলার কি যুক্তিসঙ্গত কোন সুযোগ আছে?

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁরই পথে পরিচালিত করার জন্য পথ প্রদর্শক মনোনয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর তাঁর মাধ্যমেই যাঁকে মনোনীত করা হলো তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানটি সংক্ষেপে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বছর কয়েক পূর্বে একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল– *"এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করে পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রবল ইচ্ছা রাখি খোদা চাহেন তো"*– এ বাক্যটি মরহুম মাওলানা আলী আব্বাস সাহেবের। আজ মরহুম মাওলানা নেই, তবে তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন আল্লাহ তাঁর এক বান্দার মাধ্যমে ঘটিয়েছেন ঠিকই, কবুল হয়েছে তাঁর নেক বাসনা।

এ জন্য অত্র পুস্তকের লভ্যাংশে একটি বিশেষ অংশ তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য এবং আল-কোরআনের একটি সঠিক তরজমা প্রকাশ করে তাঁর জন্য উৎসর্গ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে পাঠককুলের কাছে আমি এই শুকরিয়া আদায় না করে পারছি না

যে, এই গাদীর বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে দু'জন ব্যক্তি প্রাতঃ স্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন তৎকালীন সময়ের অগ্রবর্তী কলম সৈনিক মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ কাসেম ওরফে জান সাহেব- তাঁর **'ইমামত ও খিলাফত'** এবং কাজী মোঃ দেলোয়ার হোসেন জা'ফারী সাহেব তাঁর **'ইমামত'** পুস্তকের মাধ্যমে। তাঁরা এদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে গাদীর সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যে আলোর বিচ্ছুরণে পাঠককুলের অমিয় সুধায় অবগাহনের চরম আর্তি সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে যেন জান্নাতে পরম সুখে রাখেন, খোদা তাদেরকে কবুল করুন। আর এই আর্তি নিবারণে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াশটুকুও যেন কবুল করেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি তাদের জন্য যারা আমার এই মহান কাজে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন শেখ আমজাদ হোসাইন- ইমাম-ই জুমা ও জামায়াত, হালিশহর, চট্টগ্রাম-এর প্রতি। শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইয়েদ রেজা হোসাইনী ছাহেব, মাওলানা আলমগীর ছাহেব, ভাই শাহবাজ আহম্মদ, মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, সর্বজনাব এম. রহমান ছাহেব, ইরফানুল হক ছাহেব বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

গাদীর-এ খুম কি ও কেন?

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الامين واله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين .

ইসলামের ইতিহাসে হিজরী দশম বর্ষের ১৮ ই যিলহজ্ব দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব তাৎপর্য-মন্ডিত একটি দিন। বস্তুতঃপক্ষে এ দিনে সংঘটিত বিষয়টির উপরই নির্ভর করে ইসলামের ঐতিহ্য। এ দিনে ইসলামের এমন একটি মৌলিক বিষয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হলো যাকে বলা যায় এ মতাদর্শের শ্রেষ্ঠতম স্তম্ভ। যা ব্যতিত ইসলাম নামের বিরাট-বিশাল অট্টালিকাটি টিকেই থাকতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলিম মিল্লাতের সামনে অনুপস্থিত। যার অনিবার্য ফলই হচ্ছে মুসলিম জাতির বর্তমান শতধা বিভক্তি। এ বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ, এ কথা বলা যায় না। বরং বেশ সংখ্যক বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। কিন্তু কি জানি এক জু-জুর ভয়ে এ সত্যটি প্রকাশের পথে তাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে একদল লোক এমনও পরিলক্ষিত হয় যারা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়ে জেনে শুনে এ সত্যটিকে এড়িয়ে চলছে। সত্য বলতে কি? বর্তমান বিশ্বের ধ্বংস প্রায় মুসলিম মিল্লাতকে অন্ধকার কূপ থেকে

উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন সে সত্যের ব্যাপক প্রচার। বিদায় হজ্জের প্রাক-কালেই মহানবী (সাঃ) আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবীতে তাঁর অন্তিম সময় অতি নিকটবর্তী। সেই হজ্বের ভাষণেই তিনি এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন আর এ কারণেই তিনি আরাফাতের ময়দানে বিশাল গণসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে ইসলামের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত নীতিমালা ঘোষণা দিয়েছেন।

হজ্ব সমাপণের পর মদীনা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮ ই জিলহজ্বে মক্কা ত্যাগ করলেন। মক্কার অনতিদূরে "গাদীরে খুম" নামক স্থানে পৌঁছেছেন মাত্র। এমন সময় আল্লাহ্‌র দূত জিব্রাইল আমীন মহা প্রভুর পক্ষ থেকে একটি প্রত্যাদেশ (অহী) নিয়ে হাজির হলেন, প্রত্যাদেশটি পেয়ে মহানবী (সাঃ) হজ্ব যাত্রী কাফেলা থামিয়ে দিলেন। যারা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তাড়াতাড়ি এসে সমবেত হওয়ার জন্য কয়েকজন আহ্বানকারী পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা দ্রুত এসে সমবেত হলো। প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার 'হাজী'র এক বিশাল সমাবেশ। মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশে তৈরী করা হলো একটি উঁচু মঞ্চ। এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

যে প্রত্যাদেশের প্রেক্ষিতে তিনি ভাষণটি প্রদান করেছিলেন সর্বাগ্রে তা অবগত হওয়া দরকার। সে প্রত্যাদেশটি হলো এই ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

অর্থ ঃ *"হে রাসূল (সাঃ)! তোমার প্রতি যে নির্দেশ তোমার প্রভুর পক্ষ*

থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি লোকদের পৌঁছে দাও। আর যদি তুমি এ কাজটি না করো তাহলে রেসালাতের কোন কিছুই তুমি পৌঁছালে না। তথা রেসালাতের কোন দায়িত্বই তোমার আঞ্জাম দেয়া হলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে লোকদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের গোষ্ঠীকে হেদায়েত করেন না" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত-৬৭)।

আরাফাতের ময়দানে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির চূড়ান্ত নীতিমালা ঘোষণা দেয়ার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। বস্তুতঃ সে বিষয়টি ঘোষণার উপরই নির্ভর করে ইসলামের অস্তিত্ব। কেননা সে বিষয়টি ঘোষণা না দেয়ার কারণে মহানবী (সাঃ)-এর রেসালাতের মিশনই হুমকির সম্মুখিন পরিলক্ষিত হয়। আরো বুঝা যাচ্ছে যে, সে বিষয়টি ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) ইতস্ততঃ করছিলেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করার নিশ্চয়তা প্রদান করলেন।

উল্লেখিত আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ইত্যাদির উপর ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এখানে পরিসরের অভাবের কারণে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আশা করি এই বিষয়ে পাঠক কুলের তৃষ্ণা নিবারণে "আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ইত্যাদির উপর পর্যালোচনা মূলক সমীক্ষা" অধ্যায়ই যথেষ্ঠ হবে। আমাদের বিশ্বাস আপনারা বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। বস্তুতঃ এ পর্যায়ে অসংখ্য মোফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ গ্রন্থাবলীতে সামান্য পার্থক্য সহকারে বিস্তারিত বর্ণনাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র বর্ণনা ও কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করবো।

বর্ণনা ঃ সমস্ত মোফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ সূরাটি (আল-মায়েদাহ্) আল-কোরআনের সর্বশেষ সূরা।

জনাব আহমদ ও জনাব আবু ওবায়দা নিজ নিজ "ফাজায়েল" গ্রন্থে, জনাব নাজ্জাস স্বীয় "নাসেখ" গ্রন্থে, জনাব নাসাঈ ইবনে মুনযির, হাকেম ইবনে মারদুবিয়্যাহ্ ও জনাব বায়হাক্বী নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে জনাব জুবাইর বিন নাফী থেকে বর্ণনা করেছেন, জুবাইর বলেন "আমি হজ্বে গিয়েছিলাম, সেখানে বিবি আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ জুবায়ের! তুমি কি সূরা আল-মায়েদাহ্ পাঠ করেছো? আমি বললাম ঃ জি হ্যাঁ! তিনি বললেন ঃ এটা কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা। এতে তুমি যা যা হালাল পাবে তা তা হালাল মনে করবে আর যা যা হারাম পাবে তা তা হারাম জানবে" (তাফসীরে দুররে মানসূর, আল্লামা সুয়ূতী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩)।

জনাব আবু ওবায়েদ, জনাব মুহাম্মদ বিন কা'ব কারাতানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "এ সূরা রাসূল (সাঃ)-এর উপর বিদায় হজ্বের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি মক্কা ও মদীনার মাঝে উটের উপর আরোহী ছিলেন। প্রত্যাদেশের ভারে উটের স্কন্ধটি ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তখন তিনি উটের পৃষ্ঠ হতে নেমে পড়লেন" (তাফসীরে দুররে মানসুর, আল্লামা সুয়ূতী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত যায়েদ ইবনে আরক্বাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে আমি একটি ময়দানে অবতরণ করলাম। যা "গাদীরে খুম" নামে পরিচিত। রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিলেন। আমরা দুপুরের মাথা ফাটা রোদে নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি একটি ভাষণ দিলেন। রোদের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য এক খন্ড কাপড় একটি গাছের সাথে

ছড়িয়ে দেয়া হলো। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছনা যে, তোমাদের উপর আমার অধিকার তোমাদের নিজেদের চাইতে অধিক? লোকেরা বলল ঃ জি হ্যাঁ ! নিঃসন্দেহে। তখন তিনি বললেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده.

অর্থ ঃ "আমি যার মাওলা (শাসক) হই, এ আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালবাসবে তুমিও তাকে ভালোবেসো আর যে তার সাথে শক্রতা পোষণ করবে তুমিও তাকে শক্র জেনো" (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২)।

ইমাম নাসাঈ "কিতাবুল খাছায়েছে" যায়েদ ইবনে আরক্বাম থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি (যায়েদ) বলেন ঃ "হযরত রাসূলে মাকবুল (সাঃ) যখন বিদায় হজ্বের সময় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি "গাদীরে খুম" নামক স্থানে অবতরণ করলেন।

অতঃপর তিনি তথাকার গাছ-গাছালীর ডাল-পালা ইত্যাদি পরিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন ঃ আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই আমার প্রতি আহ্বান এসে যাবে, আর আমি সে ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত। আমি তোমাদের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিই একটি আরেকটির চেয়ে গুরুত্বের দাবীদার। একটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কোরআন ও অপরটি হলো আমার বংশধরের ঐতিহ্য ধারা তথা আমার আহ্‌লে বায়ত। আমি দেখতে চাই আমার পরে তোমরা তাদের সাথে কেমন আচরণ করছো? এ দু'টি বস্তু আমার নিকট হাউজে কাউসার এসে পৌঁছা পর্যন্ত কখনই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। তারপর বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার

"মাওলা" তথা শাসক আর আমি সমস্ত মুমিনের "ওয়ালী" বা শাসক, অতঃপর তিনি হযরত আলী ইবনে আবী তালীবের হাত ধরে বললেন ঃ

من كنت وليّه فهذا وليّه اللّهم وال من والاه وعاد من عاده .

অর্থাৎ ঃ আমি যার ওয়ালী (অভিভাবক, শাসক) হই, এ আলীও তার ওয়ালী। হে আল্লাহ্! যে তাকে ভালোবাসে তুমিও তাকে ভালোবেসো আর যে তার সাথে দুশমনি করে তুমিও তাকে দুশমন জেনো"।

জনাব আবু তোফায়েল বলেন ঃ "হযরত যায়েদ ইবনে আরক্বামকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "তুমি কি একথা স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছো? তিনি বললেন যতো লোকই সে গাছের নিকট উপস্থিত ছিল সকলেই নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে ও নিজেদের কানে শুনেছে।

[নাসাঈ, খাছায়েছে আমীরুল মু'মিনীন পৃষ্ঠা-২১। হাকেম নিশাপুরী ও তাঁর "মুসতাদরাক আলাছ্-ছহীহাইন (বোখারী ও মুসলিম) ৩য় খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনাটিই লিপিবদ্ধ করেছেন।]

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম কিছুটা সংক্ষেপে তাঁর ছহীহ্ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়েদ ইবনে আরক্বাম থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। যায়েদ ইবনে আরক্বাম বলেন ঃ "একদিন মহানবী (সাঃ) সে পুকুর বা কূপটির নিকট ভাষণ দিলেন, যাকে বলা হয় "খুম"। যা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত। তিনি (মহান আল্লাহ্র) প্রশংসা স্তুতীর পর কিছু উপদেশ-আদেশ দান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ "হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষ। সে সময়টি খুবই নিকটবর্তী যে, আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি আহ্বান এসে যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেবো। আমি তোমাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব (কোরআন) যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা। আর কোরআনের সাথে

সম্পৃক্ত থাকার জন্য লোকদের উৎসাহিত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ দ্বিতীয় বস্তুটি হলো আমার আহ্‌লে বাইত (আমার বংশধর)। আমি আমার আহ্‌লে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! আমি আমার আহ্‌লে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!! (বিষয়টির গুরুত্বানুধাবনের জন্যই তিনি এ কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন।

ছহীহ্ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২২, ফাযায়েলে আলী ইবনে আবী তালীব অধ্যায়, এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী, ইবনে আসাকির প্রমুখ অনেকেই বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার তাঁর "ছাওয়ায়েকে মুহ্‌রেকা গ্রন্থে তিরমিযী ও তাবরানীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল জনাব বারায়া ইবনে আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১, কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭, ফাযায়েলুল খামসাহ্ মিনাস্‌সিহাহ্ সিত্তাহ্, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০)।

মাওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ্ ইসলামাবাদী ফাযেলে দেওবন্দ তাঁর রচিত "আশারা মোবাশ্‌শারা" গ্রন্থে "গাদীরে খুমের" ভাষণটি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন আমরা এখানে হুবহু সে ভাষণটিই তুলে ধরলাম। তিনি লিখেছেন ঃ

"হে লোক সকল! আমি মানুষ। আল্লাহ্‌র ফেরেশতা হয়তো অতি শীঘ্রই আসিবেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ আমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি তোমাদের নিকট দুইটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। একটি হইল আল্লাহ্‌র কোরআন, যেখানে হেদায়েত এবং আলো পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান

আছে। অপরটি আমার পরিবার। তাহাদের বেলায় আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দেখি, তোমরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার কর। আল্লাহ্ আমার মাওলা আর আমি সমস্ত মুসলমানদের মাওলা" অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) এর হাত ধরিয়া ফরমাইলেন ঃ আমি যাহার মাওলা হই, ইনিও অর্থাৎ হযরত আলীও তাহার মাওলা। ইয়া আল্লাহ! এই আলীর সহিত যে বন্ধুত্ব রাখিবে, আপনিও তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখুন এবং যে তাহার সহিত দুশমনি রাখিবে, আপনিও তাহার সহিত দুশমনি রাখুন।"

(উদ্ধৃতি গ্রন্থ ঃ বোখারী শরীফ, ফতহুল বারী, সীরাতে ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী, হায়াতে মুর্তাজা)

গাদীরে খুমের এ ঐতিহাসিক "মাওলার অভিষেক" অনুষ্ঠান সম্পর্কে অসংখ্য-অগণিত বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে নানানভাবে নানান আঙ্গিকে বর্ণিত রয়েছে। সে সমস্ত বর্ণনাগুলোকে একত্রিত করে আল্লামা আমিনী "আল গাদীর" নামে বিরাট বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেছেন (যা বর্তমানে ১৮খণ্ড আরবীতে)। বস্তুতঃ ইসলামের অন্য কোন বিষয়েই এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনার সমাহার পরিলক্ষিত হয় নি।

প্রায় তিনশ ষাটেরও অধিক সংখ্যক সুন্নী বর্ণনাকারী এ বিষয়ে সামান্য বেশ-কম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে আমরা আর অধিক বর্ণনার উল্লেখ করে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করার প্রতি আপনাদের আহ্বান জানানো হলো।

গ্রন্থাবলী ঃ

১। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর- তাফসীরে কবীর, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০।

২। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর- তাফসীরে "দুররে মনসুর", ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭।

৩। আল্লামা আমিনীর– "আল-গাদীর"।

৪। আবুল কাশেম ইবনে আসাকিরের– তারীখে দামেশ্‌ক্‌, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬।

৫। ইমাম আবু ইসহাক সা'লাবীর– তাফসীরুল কাশ্‌ফ্‌ ওয়াল বায়ান।

৬। হাফেজ সুলাইমান কান্দুযী হানাফীর– ইউনাবীউল মুয়াদ্দাহ্‌, পৃষ্ঠা-১২০।

৭। কাযী মুহাঃ ইবনে আলী শাওকানীর– তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০।

৮। হাফেজ মুহাঃ ইবনে জারীর তাবারীর - কিতাবুল বেলায়াহ্‌।

৯। বদরুদ্দীন ইবনে আইনী হানাফীর– উমদাতুল কারী ফি শারহিল বোখারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৪।

১০। সাইয়্যেদ শাহাবুদ্দিন আলূসী শাফেঈ'র– রুহুল মাআনী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৪।

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব মুসলামানদের "মাওলা" তথা শাসনকার্যে "বেলায়েত" প্রাপ্ত হলেন।

"মাওলা" ও "বেলায়েত" শব্দদ্বয়ের মূল ধাতু হচ্ছে আরবী "ওয়ালী" শব্দ। এ শব্দটি আল-কোরআনে একাধিকবার এসেছে। হাদীসেও বহু স্থানে এর ব্যবহার দেখা যায়। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে দু'টি বস্তুর এমনভাবে সন্নিবেশন ও সংস্থাপন করা, যার মাঝে কোনই দুরত্ব থাকেনা। এরূপে এ শব্দটি "নিকটতম" এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হোক সে নৈকট্য স্থান বিশেষে কিংবা আত্মিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এভাবে কখনো "বন্ধুত্ব" ও "সহযোগিতার" অর্থেও প্রয়োগ হয়।

২–

পক্ষান্তরে প্রখ্যাত গ্রন্থকার আল্লামা আমিনী তাঁর "আল-গাদীর" গ্রন্থে "মাওলা" শব্দের ২৭টি অর্থ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর গাদীর দিবসের প্রেক্ষাপট সে দিনে সংঘটিত ঘটনাবলী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলী ও কোরান-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবল যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে যে অর্থটি চূড়ান্তভাবে তুলে ধরেছেন, তা হলো- শাসনকার্যে অধিকার প্রাপ্ত অভিভাবক বা শাসক।

দ্বীনের পরিপূর্ণতা লাভ ঃ

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)-কে মুসলিম মিল্লাতের "মাওলা" তথা শাসক হিসাবে ঘোষণা দিলেন। তখন প্রত্যাদেশ বাহক জিব্রাইল আমীন দ্বীনের পরিপূর্ণতা লাভের সংবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-এর হস্ত ধারণ করে ঘোষণা দিলেন যে, আমি যার মাওলা হই এ আলীও তার মাওলা। তখন মহান আল্লাহ এ প্রত্যাদেশটি নাযিল করলেন ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا .

অর্থাৎ ঃ " আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে করলাম সম্পূর্ণ। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। (সূরা আল-মায়েদাহ্‌, আয়াত নং-৩)

(আবু হোরায়রাহ্‌ বলেন ঃ সে দিনটি ছিল ১৮ই জিলহজ্ব। আল্লামা ইবনে কাসীরের "কিতাবুল বেদায়াহ ওয়ান্‌নেহায়াহ্‌, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৪)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন ঃ হযরত আলী (আঃ)-কে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা দানের পর তখন রাসূল (সাঃ)-এর উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ

اليوم اكملت لكم ...

অর্থাৎ *"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন... "* তখন মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ "মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, আজ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং খোদার নেয়ামত সম্পূর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ আমার রেসালাত ও আমার পরে আলী ইবনে আবী তালিবের বেলায়েতকে পছন্দ করেছেন।"

(হাকেম হাসকানী তার স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ও হাফেজ আবু নাঈম ইসফাহানী "মা আনযালা মিনাল কোরআন ফী আলীয়্যিন" গ্রন্থে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।)

উল্লিখিত আয়াতটি গাদীরে খুমে হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে শাসকের আসনে অভিষিক্ত করার পর অবতীর্ণ হয়েছে বলে যে সমস্ত ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও মোফাস্সিরগণ নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের থেকে মাত্র কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করছি।

১। ইবনে মাগাযেলী শাফেঈর- মানাকেবে আলী ইবনে আবী তালিব, পৃষ্ঠা-১৯।

২। খাতীবে বাগদাদীর- তারীখে বাগদাদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯২।

৩। ইবনে আসাকিরের- তারীখে দামেশ্ক্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫।

৪। হাফেজ সুয়ূতীর- তাফসীরে দুররে মনসুর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯।

৫। আল্লামা খাওয়ারযামী হানাফীর- মানাকেবে আমীরুল মু'মিনীন, পৃষ্ঠা-৮০।

৬। আল্লামা আলূসীর- তাফসীরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫।

৭। হাফেজ ইব্নে কাসীরের- আল বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৩।

৮। হাফেজ ইবনে কাসীরের- তাফসীরে কোরআনুল আজীম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪।

গাদীরে খুম-এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

يَاايها الرّسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس   ان الله لا يهدى القوم الكافرين .

"হে রাসূল! পৌঁছিয়ে দিন যাহা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর যদি ইহা আপনি না করেন তা হলে, রেসালাতের কোন দায়িত্বই পৌছালেন না এবং আল্লাহ আপনাকে মানুষের শক্রতা হইতে রক্ষা করিবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।-সূরা মায়েদা-৬৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা শীআ-সুন্নী দুই মাযহাবের শিক্ষিত, জ্ঞানী, ঐতিহাসিক, গবেষক ও মনীষীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিজ্ঞ আলিমকুল শিরমনি হযরতুল আল্লামা কাজী সানা উল্লাহ পানীপথী তার তাফসিরে মাযহারীতে, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়্যাহ ও ইবনে আসাকের (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত গাদীরে খুম দিবসে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়।

ইবনে মারদুইয়্যা হযরত ইবনে মাসুদ থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সাঃ) -এর যুগে আমরা এ আয়াতটি এভাবে পড়তাম।

يَاايها الرّسول بلغ ما انزل اليك من ربك عليا مولى المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس   ان الله لا يهدى القوم الكافرين .

(সূত্র তাফসীরে মাযহারী ৩য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত)

মাওলায়ে কায়েনাত আলী ইবনে আবি তালিবকে মহানবীর উত্তরসূরী হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য কি বিশাল আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বণনা আমরা এখানে পাবো।

গাদীরে খুম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জুফায় অবস্থিত। শেষ হজ্জ্ব সমাপনান্তে হযরত (সাঃ) যখন মুহাজির ও আনসারগণ সহ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে আল্লাহ্‌র জরুরী নির্দেশ জানিয়ে দেন। নবী সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়েন যারা সামনে চলে গিয়েছিল তাদের পিছনে ফিরতে বললেন, আর পিছনের লোকদের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক বর্ণনায় এসেছে পুরো কাফেলা যখন একত্রিত হলো তখন উটের গদিগুলো দিয়ে মঞ্চ বানিয়ে ফেলা হলো এবং আশ-পাশে পরিষ্কার করা হলো। নবীপাক (সাঃ) সেই মঞ্চে উঠে দীর্ঘ হামদে বারী তা'য়ালা পাঠ করলেন। দিনটি ছিলো প্রচন্ড গরম। ফলে পায়ের নীচে ও মুণ্ডানো মাথার উপরে পরিধেয় বস্ত্রের অংশ দিয়ে রাখতে হলো সবাইকে। মহানবী এই বলে সবাইকে সম্বোধন করলেন ঃ

"হে লোক সকল! শ্রবণ কর! তোমরা তো জানো জিব্রাইল পরম করুণাময় খোদার হুকুম নিয়ে বহুবার আমার কাছে এসেছে, সে কারণে আমি এখানে থামলাম কথাটি তোমাদের কালো ও সাদা প্রত্যেককে জানাতে যে, আবু তালিবের পুত্র আলী আমার ভাই এবং ওয়াসি (উত্তরসূরী) এবং আমার খলিফা এবং পরবর্তী ইমাম। মুসার কাছে হারুনের স্থান যেমন ছিলো আমার কাছে তার স্থান তেমন, পার্থক্য কেবল এই আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহ ও তার নবীর পরেই সে তোমাদের অভিভাবক বা শাসক।

শোন হে লোক সকল! আল্লাহ খুব আগ্রহের সাথে তাকে তোমাদের ইমাম এবং খলিফা মনোনীত করেছেন। তার প্রতি সকলেই আনুগত্য দেখাবে। একইভাবে মুহাজির (বহিরাগত) আনসার (সাহায্যকারী) এবং যারা ক্রীতদাস, বৃদ্ধ ও যুবক, বড় ও ছোট, সাদা এবং কালো; প্রত্যেকেই মানতে হবে তার কথা যারা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখে। যে তার বিরোধীতা করে সে অভিশপ্ত হোক, আর যে তাকে অনুসরণ করে সে হোক আশীর্বাদপুষ্ট আর যে তাকে বিশ্বাস করবে সে হবে সত্যিকার বিশ্বাসী।

শোন হে লোক সকল! এই শেষবারের মতো তোমাদের সমাবেশে আমি দাঁড়াচ্ছি। তাই তোমরা খোদার কথা শোন, পালন কর এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। আল্লাহ তোমাদের প্রভু, তারপর তোমাদের নবী মোহাম্মদ যে তোমাদের কাছে এ কথাগুলো বলছে সেও তোমাদের অভিভাবক, আর আমার পরে আলী হবে তোমাদের অভিভাবক ও ইমাম, আল্লাহ্‌রও এটাই ইচ্ছা। তাঁর পরে তার মাধ্যমে আমার বংশধররা ইমামত পেতে থাকবে যতদিন না তোমরা আল্লাহ ও তোমার নবীর সম্মুখীন (হাউজে কাওসার) উপস্থিত হচ্ছো।

শোন লোকেরা! মন দিয়ে কোরআন পড় এবং এর অর্থ বোঝ, স্পষ্ট আয়াত মত কাজ কর, অস্পষ্টগুলোর কাছে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ্‌র নির্দেশে কেবল এই ব্যক্তি (অর্থাৎ আলী) ছাড়া আর কেউ তোমাদের কাছে এর সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করে হুঁশিয়ারী জানাতে পারবে না। সেই আলীর হাত আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং তোমাদের সামনেই বলছি, আমি যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের অভিভাবক। সে আবু তালিবের পুত্র আলী, আমার ভাই এবং উত্তরসূরী; সর্বোচ্চ ক্ষমতাময় ও পরম প্রসংশিত আল্লাহ, তার প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।"

এই বক্তৃতায় সংক্ষেপে অন্য ইমামদের কথাও বলা হয়েছিল; বিভিন্ন সূত্রে (বর্ণনায়) তাদের পুংখানুপুংখ বিবরণও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক অনুষ্ঠানে ইমাম হোসাইনকে সম্বোধন করে নবী (সাঃ) বলেছিলেন ঃ 'তুমি একজন ইমাম এবং একজন ইমামের পুত্র, একজন ইমামের ভাই ও নয়জন ইমাম-এর পিতা এবং তাদের নবমতম হবে কাইয়েম (যে জেগে উঠবে)' (আল কান্দুজি ঃ ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দা [পৃষ্ঠা-১৬৮], অমৃতসরী আরজাহুল মাতালিব, পৃষ্ঠা-৪৪৯)।

যে কোন সামান্য দৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, ঐশী আদেশেই মহানবী (সাঃ) এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহানবী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিলেন।

প্রথমেই তিনি শ্রোতাদের জানিয়ে দিলেন যে, ঘোষণার শেষাংশে তিনি পৌঁছে গেছেন আর তিনি যে বিশ্বস্তভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বভার যথাস্থানে দিয়ে যাচ্ছেন, তার সাক্ষী রইল এই উপস্থিত লোকবৃন্দ। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তোমাদের নিজেদের চেয়ে আমি কি গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ নই?" তখন সকলে সমস্বরে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের নিজেদের উপর নিজেদের যে অধিকার আছে, তার চেয়েও তাঁর অধিকার বড়। তখন নবী (সাঃ) বললেন, 'আমি যাদের যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের তাদের অভিভাবক"। শেষে তিনি আলীকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন যে, "হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসবে তুমিও তাদের ভালোবেসো, যে আলীর শত্রু হবে তুমিও তার শত্রু হয়ো, যে তাকে সাহায্য করবে তাকে তুমি সাহায্য করো, যে আলীকে পরিত্যাগ করবে তুমিও তাকে পরিত্যাগ করো"।

অনুষ্ঠান শেষ হলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হলো-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا .

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের... নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনয়ন করলাম" (সূরা মায়েদা-৩)।

এই ঐশী যোগাযোগ স্পষ্ট করে এটাই দেখায় যে, ইমাম আলী (আঃ)-এর এই মনোনয়ন দানের মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি চিত্তে ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ আকারে অনুমোদন দিলেন। বেহেশ্‌ত থেকে আসা এই আনন্দের জোয়ারে ভেসে বিশ্বাসীরা ইমাম আলী (আঃ)-কে স্বাগত জানালেন নবীর সামনেই। আর বহু কবি এই উপলক্ষ্যে রচনা করলেন বহু পংক্তি।*

মাওলার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ

যেহেতু আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণ গাদীরের হাদীস-এর নিসংশয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন না, তাই তারা একে চাপা দেবার জন্য 'মাওলা' শব্দটি হাদীস-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন যার অর্থ 'বন্ধু'! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বোঝাতে চেয়েছিলেন, "আমি যাদের যাদের বন্ধু, আলী তাদের তাদের বন্ধু"।

এখানে উল্লেখ্য যে, নবী (সাঃ) এই ঘোষণার পূর্বে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের নফসের উপর তোমাদের চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান নই"? তাহারা সকলে বলেছিল, 'অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ"! তারপর তিনি বলেছিলেন, "আমি যার যার মাওলা এই আলীও তার তার মাওলা।"

অসুবিধা কেবল এখানেই যে, গাদীরে উপস্থিত একটি লোকও এই অভিযোগ করার মত অর্থটি ধরতে পারেন নি? নবীর বিখ্যাত কবি হাসান ইবনে সাবিত একখানা কবিতা রচনা করে সেখানে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে শুনিয়েছিলেন। যা আমরা অন্য আলোচনায় উল্লেখ করব– ইনশাআল্লাহ!

নবী (সাঃ) যখন গাদীরে খুমে ইমাম আলী (আঃ)-এর মাওলার (অভিভাবক) যে ঘোষণা দেন, তা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে, তখন হারিস বিন

---

* বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ (ক) আল্লামা আমীনির আল-গাদীর ঃ আরবী-১৮ খণ্ড; (খ) আল্লামা শারাফ উদ্দীন মূসাভীর আল-মুরাজায়াত ঃ বাংলা সংস্করণ।

নোমান ফেহ্‌রী নামে এক ব্যক্তি মদীনায় আসে এবং নিজ বাহন থেকে নেমে সেটাকে বেঁধে নবী (সাঃ)-এর নিকটে যায়, নবী (সাঃ) তখন মসজিদে নববীতে সাহাবাদের মাঝে বসেছিলেন; তখন সে জিজ্ঞাসা করল, হে মোহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদ মানতে বললেন– তা মেনে নিলাম, নামাজের হুকুম দিলেন– নামাজ পড়ি, রোজার হুকুম দিলেন– রোজা রাখি, হজ্ব করতে হুকুম দিলেন– হজ্ব করি, যাকাত দিতে বললেন– যাকাত দেই, তারপরও আপনি ক্ষান্ত হননি, আপনি আপনার চাচাত ভাই আলীকে আমাদের অভিভাবক (হাকিম) নিয়োগ করে দিলেন। এটা কি আপনার পক্ষ থেকে করেছেন, না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করেছেন। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করেছি। তখন হারিস বলল, "হে খোদা তিনি (মোহাম্মদ) যা বলেছেন যদি তা সত্য হয়, তবে যেনো আমার উপর আকাশ থেকে কোনো পাথর বা আযাব নাজিল হয়" (সূরা মাআরিজ ১-২-৩; তফসীর মাওলানা ফরমান আলী)।

এই বলে হারিস তার বাহনের কাছেও যেতে পারেনি আকাশ থেকে একটা ছোট পাথর তার মাথায় এসে পড়ে মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যায় এবং সেখানেই সে মারা যায়।

ওমর ইবনে খাত্তাব আলী (আঃ)-কে এই বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন, "স্বাগতম, হে আবু তালিবের পুত্র! আজ থেকে তুমি সকল মোমেন ও মোমেনার মাওলা (অভিভাবক), হয়ে গেলে" (আল খতিব আত তাবারি ঃ মিশকাতুল মাসাবিহ [পৃষ্ঠা ৫৫৭]; মীর খওয়ান্দ হাবিবুস সিয়ার [খণ্ড ১, পর্ব-৩, পৃষ্ঠা ১৪৪]; আত তাবারি ঃ [আল উলাইয়াহ]; আর রাজী ঃ আত তাফসীরুল কবীর [খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০]; আহমাদ ঃ মুসনাদ [খণ্ড ৪. পৃষ্ঠা ২৮১]; ইবনে আবি সায়বাহ ঃ আল-মুসান্নাফ; আবু ইয়ালা ঃ আল মুসনাদে আহমাদ ইবনে

উকদাহ এবং আরো অনেকে [আরো দেখুন আল আমিনি ঃ আল গাদীর খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৭০-৮৩]।

মাওলার অর্থ যদি বন্ধু-ই হবে তবে কেন এত সম্ভাষন জানানো? তার আগে কি ইমাম আলী (আঃ) বিশ্বাসী পুরুষ ও স্ত্রী লোকের শত্রু ছিলেন? যে কারণে উমর বললেন যে, "আজ তুমি আমাদের বন্ধু হলে?"

ইমাম আলী (আঃ) নিজেও একবার মুয়াবীয়াকে লিখে জানিয়েছিলেন, "... (তুমি কি ভুলে গেছ?) আল্লাহর নবী গাদীর খুমের সেই দিনে তার কর্তৃত্ব সম্প্রদান করে আমাকে তোমাদের মাওলা নিযুক্ত করেছেন" (আল আমিনী ঃ আল গাদীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০)।

কুরআন, আরবী ব্যাকরণ এবং সাহিত্যে বহু পণ্ডিত মনীষী মাওলা-কে আওলা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যার অর্থ 'আরো কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়া'। উদাহরণস্বরূপ সেই সব মনীষীদের নাম দেয়া যেতে পারে।

ইবনে আব্বাস (সুয়ূতীর দুররে মানসুর এ, তাফসীরে মাজিনে, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা নং ৩৫৫); আল কালবী (উদ্ধৃত করেছেন তার তাফসীরুল কাবির আর রাজী খণ্ড ২৯-২২৭, আর রাজীর-১৭৮); আল ফারা, (আর রাজী ২৯-২২৭, পূর্বোক্ত এবং আশ-শরিফ আল জুরজানি, শারুল মাওয়াকিফ খণ্ড -৩ পৃষ্ঠা-২৭১); আল-আখফাস আর আওসাত (তাঁর নিহায়াতুল -উকুল); আল বুখারী (তার সহীহ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৪০); ইবনে কুতাইবা (তার কুরতাইন খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ১৬৪) আবুল আব্বাস ছা'লাবী (তার আল শারুস সাবাহ আল মুয়াল্লাকা); জুরজানির আত তাবারি (তার তফসীরে, খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ১৭৭); আল ওয়াহিদি (তার আল ওয়াসিত); আছ-ছা'লাবী (আল কাশফাওয়াল বয়ান এ); আজ জামাখশারী (আল কাশ্শাফ এ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৩৫); আল নাফাফি (তার

তফসীরে খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২২৯); আল কাজিন আল বাগদাদী (তার তফসীরে খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২২৯); এবং মুহিবুদ্দিন আফান্দি (তার তানজিলুল আয়াত গ্রন্থে) (দেখুন, আল আমিনি ঃ আল গাদীর পৃষ্ঠা ৩৪৪-৫০)।

শানে নুযুলের বিচারে'মাওলার অর্থ' ঃ

এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখব এ হাদীস এর শানে নুযুল থেকে কোন ধরনের অর্থের অনুমানে আসা সম্ভব। যদি কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকে তবে তার মূল অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দ্যোত্না বুঝতে এর প্রেক্ষাপট (ক্বারীনাহ্) এবং নাযিল হওয়ার দিকে তাকানো উচিৎ। এই হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে যে অর্থটি খাপ খায় তা হলো 'অভিভাবক'। নিম্নে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১। ঘোষণা দেবার অব্যবহিত পূর্বে নবী উম্মাহ্র নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তা হলো ঃ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের নিজেদের উপরে নিজের যে কর্তৃত্ব আমি কি তার চেয়ে অধিক কর্তৃপক্ষ নই?" তখন তারা বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই' তারপর নবী ঘোষাণা দিলেন- "আমি যাদের যাদের মাওলা এই আলীও তাদের তাদের মাওলা"।

কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এখানে 'মাওলা' শব্দের ঘোষণায়। শব্দের অর্থ আওলা (অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া), যা পূর্ববর্তী প্রশ্নে উত্থাপন করা হয়েছে। অন্ততঃ ৬৪ জন সুন্নী আসমাউর রিজাল বিশারদ পূর্ববর্তী প্রশ্নটিকে উল্লেখ করেছেন; যাদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মাজাহ, আন নাসায়ী এবং আত-তিরমিযী (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১)।

২। ঘোষণা দেবার পরপরই মহানবী যে দোয়াটি করেন তা হলো ঃ "হে আল্লাহ ! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো, যে আলীর শত্রু তুমি তার শত্রু হও, যে আলীকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য করো, আর যে তাকে পরিত্যাগ করে তুমিও তাকে পরিত্যাগ করো"।

এই দোয়া-ই দেখিয়ে দেয় যে, সেদিন আলী এমন কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন যাতে কিছু লোক তার শত্রুও হতে পারে (এই দায়িত্ব একজন শাসকের ছাড়া আর কিছুরই হতে পারে না); আর সে দায়িত্ব পালন করতে তার প্রয়োজন পড়তে পারে সাহায্যকারী ও সমর্থকদের। এক্ষেত্রে কোন 'বন্ধুত্ব' রক্ষা করতে কি সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়?

৩। নবীর ঘোষণায় ছিলো "আমার সময় অত্যাসন্ন বলে মনে হচ্ছে যে, আমাকে ডাকা হবে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) এবং আমি তার উত্তরে সাড়া দেবো। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি নিজে তাঁর ইনতেকালের পর মুসলমানদের নেতৃত্বে দানের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

৪। সাহাবীদের স্বাগত জানানো এবং আনন্দ প্রকাশের বন্যা বয়ে যাওয়া এই ঘোষণার অর্থে 'মাওলা' (অর্থাৎ সার্বিক বিষয়ে অভিভাবক) কোনই সংশয়ের অবকাশ রাখে না।

৫। সেই অনুষ্ঠানের সময় এবং স্থান সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখুন, নবী (সাঃ) দ্বি-প্রহরে তার যাত্রা থামিয়ে আরব মরুভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রায় এক লাখ বিশ হাজার লোককে এবং কাঁটাময় তপ্ত বালুতে বসালেন, উটের গদিগুলো একত্র করে মঞ্চ বানিয়ে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন, তারপর এই আয়োজনের সবশেষে শুধু কি এতটুকু ঘোষণা দিলেন যে, 'আমাকে যারা ভালবাসবে তারা এই আলীকেও ভালোবাসে কিংবা আমি যাদের যাদের বন্ধু আলীও তাদের তাদের বন্ধু'?

এই ঘটনা কি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য? না, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু লোক আবার নবীকে এক শিশুসুলভ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করতেও কসুর করেন না।

গাদীরে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের "অভিষেক অনুষ্ঠানটি" সমাপ্ত হওয়ার পরপরই তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা শুরু হলো। মাওলানা মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী ফাযেলে দেওবন্দ স্বীয় "আশারা মোবাশ্‌শারা" গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই কথায় হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মুসলমানগণ হযরত আলী (রাঃ)-কে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। হযরত ওমর অগ্রসর হইয়া ফরমাইলেন ঃ হে আলী! মুসলমানদের মাওলা মনোনীত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি" (উদ্ধৃতি গ্রন্থ ঃ বোখারী শরীফ, ফতহুল বারী, সীরাতে ইবনে হেশাম, তারীখে তাবারী, হায়াতে মুর্তাজা)।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ "মহান আল্লাহ আমার রেসালাত ও আমার পরে আলী ইবনে আবী তালীবের বেলায়েতকে খুব পছন্দ করেছেন"। অতঃপর তিনি আলী ইবনে আবী তালিবের জন্য একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তিনি নিজে একটি খীমায় গমন করলেন এবং একটি আসনে বসলেন। তারপর আলীকে নিজের সম্মুখে সামনা-সামনি বসালেন এবং সমস্ত মুসলমানদের মোবারকবাদ জানানোর নির্দেশ দিলেন। তাদের মধ্যে রাসূলের স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। লোকেরা দলে দলে এসে হযরত আলীকে মুসলমানদের মাওলা হওয়াতে মোবারকবাদ জানাতে লাগলেন এবং সমস্ত মুমিনদের আমীর (নেতা) পদে মনোনীত হওয়াতে তাঁকে সালাম জ্ঞাপন করতে থাকলেন। তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং ওমরও ছিলেন। তারা এগিয়ে এসে এ কথা বলতে থাকলেন ঃ

اصبحت وامسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة

অর্থাৎ ঃ "মোবারকবাদ, মোবারকবাদ জানাই আপনাকে হে আলী ইবনে

আবী তালিব! আপনি আমাদের ও সমস্ত মুমিন-মুমিনাদের "মাওলা" মনোনীত হয়েছেন।

এ ঘটনাটি ইমাম আবু হামেদ গায্যালী তাঁর সিররুল আলামীন গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১, তাফসীরে তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৮, এ ছাড়াও জনাব বায়হাক্বী, সা'লাবী, দারু কুতনী, ফখরুদ্দীন রাযী ও ইবনে কাসীর প্রমুখ ওলামাবৃন্দ লিপিবদ্ধ করেছেন।

দীর্ঘক্ষণ থেকে যে আলোচনাটি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মহান আল্লাহ্‌রই নির্দেশক্রমে হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা দিলেন। বরং রাসূলের অব্যবহিত পরই হযরত আলী মুসলমানদের শাসক মনোনীত হলেন। শুধু তাই নয় তাঁর এ "বেলায়েত" প্রাপ্তি দ্বারা ইসলামও পরিপূর্ণতার শীর্ষে আরোহন করলো। সাথে সাথে লক্ষাধিক মুসলমান তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন।

হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের "বেলায়েত" সম্পর্কে আল-কোরআনে আরো বহু আয়াত রয়েছে। আমরা এখানে আরেকটি আয়াত তুলে ধরছি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের ওয়ালী (অভিভাবক তো কেবলমাত্র) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং সে সমস্ত মু'মিন ব্যক্তিরা যারা যথারীতি নামায কায়েম করে ও

রুকু অবস্থায় যাকাত পরিশোধ করে। যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং সে মু'মিনদের বেলায়েতকে মেনে নিবে (সে আল্লাহ্র দলের অন্তর্ভূক্ত)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দলই বিজয়ী দল (সূরা আল-মায়েদাহ্, আয়াত ৫৫-৫৬)।

এ আয়াতটির অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট খুবই লক্ষণীয়, আবু ইসহাক সা'লাবী তাঁর 'তাফসীরে কবীরে' সনদসহ হযরত আবু যর গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু যর) বলেন, "আমি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট থেকে আমার নিজের কানে শুনেছি। যদি না শুনে থাকি, তাহলে আমার কান বধির হয়ে যাক এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, আর যদি না দেখে থাকি তাহলে আমার চক্ষুগুলো অন্ধ হয়ে যাক। তিনি [রাসূল (সাঃ)] বলতেন ঃ "আলী সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী ও কুফরী ধ্বংসকারী। সফলকাম সে ব্যক্তি যে তার সাহায্য করবে আর ব্যর্থ সে ব্যক্তি যে তার সাহায্য পরিহার করবে"।

আবু যর আরো বলেন, "একদিন আমি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একজন ভিখারী মসজিদে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো। কিন্তু কেউ তাকে কিছুই দিল না। তখন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলের আংটিটা খুলে তাকে (ভিক্ষুককে) দিয়ে দিলেন। এ ঘটনায় মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত বিনম্রভাবে মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানালেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার অভিভাবক! আমার ভাই মুসা (আঃ) তোমার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিল। "হে আমার পরওয়াদিগার ! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। সহজ করে দাও আমার কর্মতৎপরতা। দূর করে দাও আমার মুখের জড়তা, যাতে করে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার আপনজনদের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুন (আঃ)-কে আমার

সাহায্যকারী উযীর হিসাবে নিয়োগ কর। যাতে করে আমি শক্তি অর্জন করতে পারি। তাঁকে আমার কর্ম-কান্ডের অংশীদার বানিয়ে দাও। যেন অধিক পরিমাণে আমি তোমার গুণ-গান করতে পারি ও তোমার স্মরণে লিপ্ত থাকতে পারি"। তখন তুমি তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ (অহী) পাঠিয়েছিলে ঃ "হে মুসা! তোমার প্রার্থনা গৃহিত হয়েছে"। হে আমার আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা ও নবী। তুমি আমারও বক্ষকে করো প্রশস্ত, আমার কাজকেও করে দাও সহজ। আর আমার আপনজনদের মধ্য থেকে আলীকে আমার সাহায্যকারী উযীর হিসাবে নিয়োগ করো, যাতে করে আমার কোমর সুদৃঢ় করতে পারি"।

হযরত আবু যর গিফারী বলেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর দোয়া-প্রার্থনা সমাপ্ত করেছেন মাত্র, সাথে সাথেই জিব্রাইল আমীন উল্লিখিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

উল্লিখিত আয়াতটি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে ফেরকা-মত নির্বিশেষে সব মাযহাবেরই অসংখ্য মোফাস্‌সির ও মোহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলামঃ

১। আল্লামা যামাখশারীর- তাফসীরে কাশ্‌শাফ ওয়াল বায়ান।

২। আল্লামা তাবারীর- তাফসীরে জামে-উল-বায়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

৩। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর- তাফসীরে কবীর, ১২শ খণ্ড।

৪। আল্লামা ইবনে কাসীরের- তাফসীরে কোরআনুল আজীম ২য় খণ্ড।

৫। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর- তাফসীরে দুররে মনসুর ২য় খণ্ড।

৬। আল-জামেউ বাইনাস্‌সিহা আস-সিত্তাহ্।

৭। সুনানে নাসাঈ।

৮। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল।

৯। ছাওয়ায়েকে মুহ্রিকা।

১০। শরহে নাহ্জুল বালাগাহ্।

১১। আল্লামা মাজলিসীর -বিহারুল আনোয়ার।

১২। আল্লামা আহমদ আমিনীর- আল-গাদীর।

১৩। আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাইর - তাফসীর আল মীযান।

এতদ্ব্যতীত রাসূলে আকরাম (সাঃ) নবূয়্যত ঘোষণার পর থেকে মৃত্যু অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বার বার অনুশীলন করে দেখিয়েছেন যে, হযরত আলীই তাঁর স্থলাভিষিক্ত- উত্তরাধিকারী। এরূপ ঘটনা আরো যথেষ্ট রয়েছে। সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার প্রতি ইংগিত করছি।

এক ঃ

রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নবুয়্যত ঘোষণার ৩য় বর্ষে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূলের নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট হলেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ

অর্থাৎ (হে রাসূল!) "তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন কর" (দেখুন সূরা শো'আরা ঃ আয়াত ২১৪)।

এরপর মহানবী (সাঃ) একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে একটি দাওয়াতের আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। কিন্তু রাসূলের নির্দেশ পেয়েই তিনি দাওয়াতের আয়োজন করলেন। রাসূলের আত্মীয় স্বজনগণ তাঁর দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হযরত হামযা, হযরত আবু তালিব,

হযরত আব্বাস, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আলী সকলকেই ভদ্রোচিত ভাবে খাবার পরিবেশন করে আপ্যায়িত করলেন। এরূপে পরপর তিনদিন দাওয়াত করে পানাহার করালেন। ৩য় দিন পানাহার শেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"হে আবদুল মোত্তালিবের সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য এমন বস্তু নিয়ে এসেছি যা তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের উত্তম নেয়ামত সমূহ দ্বারা ভুষিত করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে আমাকে আমার এ কাজে সাহায্য করবে"? সকলেই তখন নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। তখন হযরত আলী দন্ডায়মান হলেন এবং বললেন ঃ "আমি আপনাদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কম ও কম শক্তির অধিকারী। তবুও আমি সর্বদা আপনার সহায়ক হিসাবে থাকবো"।

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ "তুমি বসো"। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতি বারেই সকলে নীরব থাকলো। কিন্তু হযরত আলী প্রত্যেকবারই দাঁড়িয়ে নিজেকে রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্য ও সহায়ক হিসাবে পেশ করলেন। তৃতীয়বার তিনি এমনভাবে নিজেকে পেশ করলেন যে, রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "তুমি আমার ভ্রাতা এবং আমার ওয়ারিশ হবে"। হযরত আলীর কথায় উপস্থিত লোকদের অনেকেই আশ্চর্য বোধ করলো। এতটুকু ছোট বালক এই দুঃসাহস করলো! (মাওলানা মোঃ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, ফাযেলে দেওবন্দ রচিত "আশারা মোবাশ্‌শারা", পৃষ্ঠা-১৫৪)।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাটিই সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। তারীখে তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭, তারিখে কামেল ইবনে আসীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২২, খাছায়েছে নাসাঈ, পৃষ্ঠা-১৩, মুসনাদে আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬০, দালায়েলে বায়হাকী,

তারীখে খামীস, তাফসীরে সা'লাবী, হুরইয়াতুল আওলিয়া, মাআরেজুন্নবুয়্যাহ্, মাদারেজুন্নবুয়্যাহ্, এযালাতুল খেফা, তারীখে ইসলাম-আব্দুল হাকীম নাশতার রচিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪, ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর নব্যুয়তী মিশনের সূচনা থেকেই স্বীয় স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীর বিষয়টি মীমাংসা করে গেছেন। এর দ্বারা আরো পরিস্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, হযরত আলীই হচ্ছেন রাসূলের অব্যবহিত পর মুসলিম জাতির কর্ণধার।

দুই ঃ

হিজরী নবম সনে রাসূল (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে, রোমক সম্রাট মদীনা আক্রমণ করবে। তাই তিনি ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকের দিকে অগ্রসর হলেন। যাওয়ার সময় হযরত আলীকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং বললেন ঃ "হে আলী! তুমি আমার পরিবর্তে মদীনার শাসনভার চালিয়ে যাও এবং আমার পরিবারবর্গেরও হেফাযত কর"। এ কথা শুনে কেউ কেউ বলল যে, আলী এবার রণক্ষেত্রে যাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাকে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সরদার বানানো হয়েছে। এ কথা শুনে হযরত আলী রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন ঃ "লোকেরা এরূপ বলাবলি করছে"। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "হে আলী! তুমি কি তাতে রাজী নও যে, যেভাবে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন তদ্রুপ আমিও তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাই? হে আলী! খোদার নির্দেশ হচ্ছে মদীনায় আমি বর্তমান থাকবো অথবা তুমি থাকবে"।

(মাওলানা মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী- ফাযেলে দেওবন্দ রচিত আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃষ্ঠা-১৬২, ছহীহ্ বোখারী, কিতাবুল মাগাযী, ফতহুল বারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭।)

তিন ঃ

হিজরী নবম সনেই প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে হজ্ব যাত্রী কাফেলা প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ মক্কায় গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সূরা বারাআত (তাওবা) পাঠ করে শুনাবে। কাফেলা কিছু দূর যেতে না যেতেই ডেকে ফিরিয়ে আনা হলো এবং নেতৃত্বের এ দায়িত্বটি হযরত আলীর উপর ন্যস্ত করা হলো। হযরত আবু বকরের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আমার উপর খোদার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যেন আমি নিজে যাই অথবা আমার বংশের কাউকে প্রেরণ করি। অতঃপর হযরত আলী (মক্কায় গিয়ে) রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন ঃ "এর পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তিই উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে যে কোন প্রকারের অঙ্গীকার করেছে, সে যেন তা পূর্ণ করে"।

এ ঘটনাটি সামান্য পার্থক্য সহকারে অনেক গ্রন্থকারই লিপিবদ্ধ করেছেন [তথ্য সূত্র ঃ আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃষ্ঠা-১৬২, ছহীহ্‌ বোখারী, প্যারা-২, পৃষ্ঠা-২৩৮, কানযুল ওম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬, তাফসীরে দুররে মনসুর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১০, তারীখে খামীস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৬০, খাছায়েছে নাসাঈ, পৃষ্ঠা-৬১]।

এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে, রাসূলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা কিংবা রাসূলের দায়িত্বাবলী আঞ্জাম দিবার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র হযরত আলী (আঃ)-এরই রয়েছে।

চার ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "আরবের সরদারকে আমার কাছে পাঠাও"। আমি বললাম "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই

তো আরবের সরদার"। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "আমি সমগ্র মানব জাতির সরদার আর আলী হলো আরবের সরদার"।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনাটি উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি, তাতে যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছি, আমাদের বিশ্বাস-তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি চক্ষুষ্মান, প্রশস্ত আত্মার অধিকারী ও সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এখন আর কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় এবং সন্দেহের আদৌ অবকাশ নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে। এরপরও যারা হযরত আলীর বেলায়েতকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে, তাদেরকে বিশেষ দু'টি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

১। এ ঘটনাটি এমন এক ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কিত যে হযরত আলীর "বেলায়েতকে" অস্বীকার করেছিল। এ কাজটি সে তখন করেছিল যখন হযরত আলী রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন লোকেরা এ কথাও জানতে পেরেছিল যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যারা এখন এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া।"

ঘটনাটি এরূপ ঃ হারেস ইবনে নোমান ফেহ্‌রী যখন এ সংবাদটি জানতে পারলো, তখন বিষয়টি তার কাছে ভাল লাগেনি। সে সোজা রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে বললো- "হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সাক্ষ্য দেই- "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ (অধিপতি) নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল"। আমরা আপনার এ কথা মেনে নিয়েছি। আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়ি, রমযান মাসে রোযা রাখি, কা'বা ঘরের তাওয়াফ

করি ও নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত দেই, আমরা আপনার এ কথাও মেনে নিয়েছি। কিন্তু আপনি এখানেই ক্ষান্ত হননি। এখন স্বীয় চাচাতো ভাইকে সবার উপরে তুলে ধরলেন। তাকে অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন করলেন এবং বলে দিলেন ঃ "আমি যার মাওলা হই, এ আলীও তার মাওলা"। এ কথা কি আপনার নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন নাকি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে?

এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর চক্ষুগুলো রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন ঃ "এক খোদার কসম! একথা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলছি। আমার নিজের তরফ থেকে নয়। এ কথাটি তিনি (রাসূল) তিনবার উচ্চারণ করলেন।

হারেস দাঁড়িয়ে উঠে বললো ঃ "হে আল্লাহ! মোহাম্মদ (সাঃ) যা বললেন, যদি তা সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমার উপর পাথর বর্ষন করো অথবা আমার প্রতি কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো"।

বর্ণনাকারী বলেন যে, সে তখনো নিজের উটের নিকটে পৌঁছতে পারেনি। অমনি একটি পাথর আকাশ থেকে তার মাথার উপর এসে পড়লো এবং সে সেখানেই ধ্বংস হয়ে গেলো।

(আবু ইসহাক সা'লাবীর- তাফসীরুল কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতুবীর- তাফসীরে জামেউল আহকামুল কোরআন, ১৮শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮, মোহাম্মদ রশীদ রেযা রচিত তাফসীরে আল-মিনার, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮, হাফেজ হাসকানীর-শাওয়াহেদুত্তানযীল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২৩, হাফেজ নিশাপুরীর-মুস্তাদরাক আলাছ্‌ছহীহাইন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০২, আলী ইবনে বোরহানুদ্দীন হালাবীর-সীরাতে হালবীয়্যাহ্‌, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৫, বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা আমিনীর "আল-গাদীর অধ্যয়ন করুন।

২। এ ঘটনাটি সে সমস্ত লোকদের শাস্তি সম্পর্কে যারা গাদীরের ঘটনাকে গোপন করার চেষ্টা করেছে, যাদের উপর মাওলা আলীর অভিশাপ লেগেছে।

এ ঘটনাটি তখন সংঘটিত হয়েছে যখন মাওলা আলী তাঁর খেলাফত কালে কুফায় এক গণসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন ঃ "আমি মুসলমানদের প্রত্যেককে খোদার কসম দিচ্ছি যে, সে যদি "গাদীরে খুমে" উপস্থিত থেকেছে এবং রাসূলের মুখে এ কথা শুনেছে ঃ "আমি যার মাওলা হই এ আলীও তাঁর মাওলা"। তাহলে সে দাঁড়িয়ে সে কথার সাক্ষ্য দিবে যা সে শুনেছে। কিন্তু কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই দাঁড়াবে যে সেদিন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে ও নিজের কানে শুনেছে"।

এ কথা শুনে ত্রিশজন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন, যাদের মধ্যে ষোলজন সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আলীর হাত ধরে লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "হে লোক সকল ! তোমাদের কি জানা আছে যে, মুমিনদের উপর তাদের নিজেদের চাইতে আমার অধিকার বেশী"? উত্তরে সকলেই বলেছিল ঃ "জী হ্যাঁ"! অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আমি যার মাওলা হই এ আলীও তাঁর মাওলা ..."।

কিন্তু কোন কোন সাহাবী যারা গাদীর দিবসে উপস্থিত ছিল, হযরত আলীর সাথে হিংসার কারণে বসেই ছিল। দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় নাই। তাদের মধ্যে আনাস ইবনে মালেকও ছিল। হযরত আলী মঞ্চ থেকে অবতরণ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে আনাস! তোমার কি হয়েছে, তুমি অন্যান্যদের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সেদিন যা শুনেছিলে তার সাক্ষ্য দিলে না? আনাস বললো ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার মনে নেই সেদিন কি কথা হয়েছিল।" হযরত আলী বললেন ঃ যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে

আল্লাহ্ তোমাকে শ্বেত রোগে আক্রান্ত করে দেবেন। তারপর আনাস সেখানে থেকে উঠেও সারতে পারেনি তার মুখের উপর শ্বেত-ধবল রোগের চিহ্ন পড়ে গেল।

এরপর থেকে আনাস কাঁদতে থাকতো আর বলতে থাকতো- আমি সত্যের সাক্ষ্য দেই নাই, গোপন করেছিলাম। এ জন্য আমার উপর খোদার নেক বান্দা আলীর অভিশাপ পড়েছে"।

এ বিখ্যাত ঘটনাটি ইবনে কোতাইবা তাঁর "কিতাবুল মাআরেফ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পৃষ্ঠা-২৫১।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক ছাড়াও আরো দু'জন লোক ছিল, তারা হলো- বারাআ ইবনে আযেব ও জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালী।

আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী বলেন ঃ এ তিনজনের কেউই উঠে সাক্ষ্য দেয়নি। হযরত আলী কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন তারপরও তারা কেউ কিছু বলেনি। এতে হযরত আলী বললেন ঃ "হে আমার অভিভাবক! যে কেউই জেনে শুনে এ সত্যটি গোপন করছে, তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিওনা যতক্ষণ না তাদের উপর কোন নিদর্শন লেগে যায়। যাতে করে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। অতঃপর আনাস ইবনে মালেক শ্বেত রোগে আক্রান্ত হলো। আর বারাআ ইবনে আযেব দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেল এবং জরীর পুনরায় অস্বাভাবিক বদ্দুতে পরিণত হলো।

বিখ্যাত এ ঘটনাটি অনেক ঐতিহাসিকগণই নিজ নিজ গ্রন্থে লিখেছেন। যেমন- ইবনে আসাকির- তারীখে দামেশ্ক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭ ও ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫০, শরহে নাহ্জুল বালাগাহ্, তাহ্কীকে মুহাম্মদ আবুল ফজল, ১৯শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭, মীর হামেদ হোসাইন মুসাবী, আবাকাতুল আনোয়ার, ২য়

খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৯, ইবনে মাগাযেলী-মানাকেবে আলী ইবনে আবী তালিব, পৃষ্ঠা-২৩, সীরাতে হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৭।

পরিশেষে একটা কথা আপনাদের স্মৃতি জগতে অংকিত করে রাখার আহ্বান জানাবো। সেটা হলো এ যে, নবীর স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের এ ধারা কেবল মাত্র সর্বশেষ নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় নাই বরং প্রত্যেক নবীই তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছেন মহান আল্লাহ্র নির্দেশে। আল্লামা মাজলিসি ও আল্লামা বাহাঈ প্রমুখ অনেকেই লিখেছেন যে, সকল নবীরই স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হয়েছে ১৮ই জিলহজ্ব তারিখে।

আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ইত্যাদির উপর মুফাস্সেরীনগণের **পর্যালোচনামূলক সমীক্ষা**

স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনই ছিল রিসালতের শেষ কাজ ঃ

এই আয়াতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার দ্বারা অত্র আয়াত কারীমাকে ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত ও এর বিষয়াবলী থেকে আলাদা করে ফেলেছে। এই আয়াতের মধ্যে নির্দেশিকা, মৌলিক বিষয় শুধুমাত্র নবী (সাঃ)-এর সাথেই জড়িত এবং এই আয়াত শুধু তারই দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করেছে।" (ইয়া আইয়্যুহার রাসুলু) হে নবী (দঃ)!" থেকে এই আয়াত শুরু হয়েছে এবং এই আয়াত নবী (সাঃ)-কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাকিদের সাথে নির্দেশ দিতেছিলেন যে, যাহা কিছু তাঁর পরোয়ারদেগারের পক্ষ হইতে নাযিল করা হয়েছে উহা মানুষের নিকট পৌঁছে দিন (বাল্লেগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিক)। অতঃপর (ঐ নিদের্শের গুরুত্ব প্রকাশ করে) বার বার হুকুম করার দ্বারা এ ব্যাপারে এমন একটি আশঙ্কার গুরুত্বারোপ করিতেছে যে, যদি আপনি এই কাজ না করেন (বরং ঐ কাজ সমাধা করা থেকে কখনো বিরত হবেন না) তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, আপনি রিসালাতের কোন কাজই সমাধা করেন নাই (ওয়া ইন লাম তাফয়াল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু) এরপর নবী (সাঃ) এর দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানী দূর করার জন্য তিনি শান্তনা দিয়ে বলেছেন ; এই রিসালাত ও পয়গাম প্রচার করার ব্যাপারে আপনার হয়রান-পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা খোদা আপনাকে ঐ দুষ্টচক্রের দুষ্টামী এবং বিরুদ্ধাচরণ থেকে হেফাজত করবেন (ওয়াল্লাহু ইয়া'চিমুকা মিনান্নাস)।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা এই বিশেষ পয়গামকে অস্বীকার করে এবং উহার বিরোধিতা করে কুফরী অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাদের ধমকি এবং শাস্তির ঘোষণার কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ হঠকারী কাফিরদেরকে কখনো হেদায়েত করেন না (ইন্নাল্লাহা লাইয়াহদি কাওমাল কাফিরিন)।

আয়াতে বাক্যাবলী সংযোজন শৈলী, উহার বিশেষ বৈশিষ্টাবলী এবং এতে একের পর এক তাকিদের পর তাকিদ ও আয়াতে ("ইয়া আইয়্যুহার রাসুলু") দ্বারা আরম্ভ হওয়া; যাহা সমগ্র কোরআনুল কারীমে শুধু মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে এবং এই হুকুম তামিল ও রিসালাতের প্রচার না করা অবস্থা নবী (সাঃ)-কে এই বলে সর্তক করেছেন যে, যদি আপনি এই নির্দেশ পৌঁছানোর মধ্যে কোনরূপ গড়িমসি করেন– তা'হলে এর উদ্দেশ্য হবে এই যে, 'আপনি রিসালাতের কোন কাজই আঞ্জাম দেন নাই', যাহা কোরআন মজিদের শুধু মাত্র এই আয়াতেই রয়েছে। এই কথায় প্রমাণ করে যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কিত যে, তাহার প্রচার না করা বা ঘোষণা না দেওয়া রিসালাতের কোন কাজ না করারই শামিল হবে।

এছাড়া এই কথাও প্রকাশ পায় যে, এই বিষয়টি এমনই একটি বিষয় ছিল, যাহার সাথে কঠিনভাবে বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর বিরোধিতাকারীরা এতই কঠোর ছিল যে, তাদের বিরোধিতার স্বরূপ দেখে নবী (সাঃ) রীতিমত পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন যে, এমন যেন না হয় এই ঘোষণা শুনে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সমূহ বিপদের কারণ সৃষ্টি করে না দেই। এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহাকে শান্তনা দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সর্বশেষ উহা এমনকি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল? যা মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবীপাক

(সাঃ)-কে এত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছিলেন? এই অবস্থায় আমরা যখন এই সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালের উপর গবেষণা করি তাতে এই কথাই অনুধাবন হবে যে, এই সূরাটি ইসলামের নবীর জীবনের সর্বশেষ সময়কালে নাযিল হয়েছিল।

ইহা কি একত্ববাদ, শিরক, মূর্তিপুজা সংক্রান্ত সমস্যার কোন মাসায়েল ছিল? যাহা কি-না নবী (সাঃ) ও মুসলমানদের জন্য বহু বছর পূর্বে সমাধান হয়ে গিয়েছিল। অথবা ঐ মাসায়েলটি আহকামে শরিয়ত তথা ইসলামী নীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত ছিল? আর তাহাও ঐ সময় পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছিল।

অথবা এই সমস্যাটি আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী, নাসারাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল? বরং আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, বনি নযির, বনি কুরাইযা, বনি কায়নুকা খায়বার ও ফাদাকে এবং নাজরানের খৃষ্টানদের ঘটনার পর আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার মত কোন জটিল সমস্যার অনুভূত হয় নাই।

অথবা উক্ত সমস্যাটি কি মুনাফিক সংক্রান্ত ছিল? বরং এখানে আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবে ইসলামের জয় জয়কার অবস্থা তখন মুনাফিকদের অস্তিত্বের আর কোন স্থান রহিল না এবং তাদের শৌর্য্যবীর্য্য সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আর তাদের কাছে যা কিছু ছিল তাহাও গোপন ছিল।

তাহলে প্রকৃত পক্ষে উহা কোন সমস্যা ছিল যাহা হুজুর আকরাম (সাঃ) এর জীবনের শেষ দিনগুলোতেও অবশিষ্ট ছিল যে, আলোচ্য আয়াতে যার মধ্যে এই ধরনের তাকিদ করা হয়েছে?

এই প্রকৃত সত্যতা অস্বীকার করার কোনই সুযোগ নাই যে, পয়গাম্বর

(সাঃ) এর দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী নিজ জাতি বা নিজ স্বত্বার অস্তিত্বের জন্য ছিল না বরং এই আশঙ্কা ওয়াদা ভঙ্গকারী বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে একটি প্রচন্ডতম বিরোধিতার ব্যাপারে ছিল। যার ফলাফল মুসলমানদের জন্য ছিল বিপদজনক ও ক্ষতিকর রূপেরই বহিঃপ্রকাশ।

তাহলে কি নবী (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পরবর্তী করণীয় ছাড়া এমন কোন সমস্যা ছিল? যাতে উহার কোন নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছিল?

এখন আমি ঐ সকল বিভিন্ন বর্ণনার দিকে ফিরে যাচ্ছি যাহা আহলে সুন্নাত ও আহলে তাশাইউগণের অসংখ্য গ্রন্থাদিতে আলোচ্য উপরের আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, উক্ত আয়াতে আলোচ্য ধারণা প্রমাণ করার মাধ্যমে কতই না সুবিধা অর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আমরা ঐ সকল মতবিরোধ ও প্রশ্নাবলীর উপর পর্যালোচনা করবো যাহা অত্র ব্যাখ্যার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অসংখ্য মুফাস্‌সেরিনগণের পক্ষ হতে প্রকাশ করা হয়েছে।

আয়াতের শানে নযুল

যদিও পরিশেষে পরিতাপের সহিত এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত সত্যতা কোন প্রকার আড়াল করা ছাড়া মুসলমানদের নিকট পৌঁছানো হয় নাই। পূর্ব মীমাংসিত এই ফায়সালা ও মাযহাবী গোড়ামীর কারণে এই সত্যের প্রচার ও প্রসার বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আজো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি বিশেষ করে এ বিষয়টি তাঁদের তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে রয়েছে। এর মধ্যে বহু সংখ্যক রাওয়ায়েতে এমনও পাওয়া যায় যা স্পষ্টভাবে এই সত্যতার আলোচনা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে কারীমা হযরত আলী (আঃ)-এর ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছে। এই রাওয়ায়েত রাসূল (সাঃ)-এর অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরামগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ যায়েদ ইবনে আরক্বাম, আবু সাঈদ খুদরী, ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, আবু হুরাইরাহ,

বারা'য়া ইবনে আযেব, হুজাইফাহ, আমের বিন লাইলা বিন যিরাহ এবং ইবনে মাসউদ উনারা সকলেই আসহাবে রাসূল ছিলেন ও এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতখানি হযরত আলী (আঃ) ও গাদিরের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য এই হাদীস খানা আছহাবে রাসূল কর্তৃক বিভিন্ন ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

যায়েদ ইবনে আরকামের বর্ণনা করা হাদীস একটি ধারাবাহিকতায়;

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনাকৃত হাদীস এগারটি ধারাবাহিকতায়;

ইবনে আব্বাস এর বর্ণনাকৃত হাদীস এগারটি ধারাবাহিকাতায়;

বারা'য়া ইবনে আযেব এর বর্ণনাকৃত হাদীস তিনটি ধারাবাহিকতায়;

যে সকল উলামা এই হাদীস সমূহ স্বীয় গ্রন্থাদিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের মধ্যে হতে উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১। হাফিজ আবু নাঈম ইসফাহানী স্বীয় কিতাব "মা নাযাল মিনাল কোরআনা ফি আলী"-র ২৯ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েত সহ লিখেছেন।

২। আবুল হাসান ওয়াহেদী নিশাপুরী বর্ণনা করেছেন তার আসবাবে নুযুল গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায়।

৩। হাফিজ আবু সাঈদ সিযিস্তানী বর্ণনা করেছেন তার কিতাবুল বিলায়েতে।

৪। ইবনে আসাকির শাফী বর্ণনা করেছেন দুররে মনসুরের দ্বিতীয় খন্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায়।

৫। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী বর্ণনা করেছেন তার তাফসিরুল কবিরের ৩য় খন্ডে ৬৩৬ পৃষ্ঠায়।

৬। আবু ইসহাক হুমায়ূনী বর্ণনা করেছেন তার ফারায়েদুল মাতীনে।

৭। ইবনে ছিবাগ মালেকী বর্ণনা করেছেন তার ফছুল আল-মুহিম্মাহ -এর ২৭ পৃষ্ঠায়।

৮। জালাল উদ্দিন সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসির দুররে মানসুরের

২৯৮ পৃষ্ঠায়।

৯। কাজী শাওকানী বর্ণনা করেছেন তাঁর ফতহুল ক্বাদীরের ৩য় খন্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায়।

১০। শাহাবুদ্দিন আলুসী শাফী বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসীরে রুহুল মানীর ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায়।

১১। শেখ সুলাইমান কান্দুজী হানাফী বর্ণনা করেছেন ইনাবিউল মুয়াদ্দাতের ১২০ পৃষ্ঠায়।

১২। বদরুদ্দিন আইনী আল-হানাফী বর্ণনা করেছেন তার উমদাতুল ক্বারী ফি শরহে ছাহীহ্ আল বুখারীর ৮ম খন্ডে ৫৮৬ পৃষ্ঠায়।

১৩। শেখ মুহাম্মদ আব্দুহ্ মিসরী (যিনি জামাল উদ্দিন আফগানীর ছাত্র ছিলেন) বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসীরুল মানারের ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায়।

১৪। হাফিজ ইবনে মারদুবীয়া ও দুররে মানসুরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াতের এই শানে নুযুলই বর্ণনা করেছেন; এতে এই ধারণা করার অবকাশ নেই যে, উক্ত উলামা ও মুফাসসিরগণ এই আয়াতকে হযরত আলী (আঃ)-এর শানে নাযিল হয়েছে বলেই আমরা তা বিশ্বাস করি বা গ্রহণ করেছি তা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো উনারা নিজ নিজ কিতাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন তা তুলে ধরা।

এ কথাও বলার সুযোগ নেই যে, পূর্ব থেকে বর্ণনাকৃত এই সিদ্ধান্তগুলো ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কেবলমাত্র তাঁরা স্বীয় সমাজের ভীতিকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রসিদ্ধ রাওয়ায়েত গুলোকে গ্রহণ করেছেন তা নয় বরং তাঁরা পূর্ব মীমাংসিত এই ধারাবাহিক বিষয়টি সঠিক প্রমাণিত করতে গিয়ে বাধাগ্রস্তও হয়েছেন; তা না হলে অনেকে তো এই চেষ্টাও করেছেন যে, যে করেই হউক এই বিষয়ের গুরুত্বকে ঘটা করে প্রকাশ করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী যিনি ধর্মীয় বিশেষ বিষয়াবলীতে বিরোধিতায় সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি এই আয়াতের

শানে নুযূলের গুরুত্ব কমানোর জন্য তার বর্ণনায় দশম ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন। আর এর পূর্বে বর্ণনাকৃত নয়টি বর্ণনাই ছিল অত্যন্ত দুর্বল, অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ।

আমরা ফখরুদ্দিন রাজীর উপর তেমনটা আশ্চর্যান্বিত হইনি। কারণ তিনি সর্বদাই এই স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বর্ণনা করে থাকেন। বরং আশ্চর্য্য তো ঐ সকল দৃষ্টি ভঙ্গির লেখকদের উপর, যাহারা এই আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কিন্তু তাদের রচনাকৃত পুস্তকাদিতে এই বিষয়ে মূলতঃ কোন আলোচনাই করেন নাই। বরং এই বিষয়ে এতই কম গুরুত্ব দিয়েছেন যে কেহই এই বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণই করেন নি। যেমন সাইয়্যেদ কুতুব তার ফি যিলালিল-এ এবং মুহাম্মদ রশিদ রেজা আল-মানারে এই আয়াতের শানে নুযুল মোটেই বর্ণনা করেন নাই।

আমাদের বুঝে আসে না যে, তাদের মহল কি এই বিষয়ের নিগূঢ় রহস্য বর্ণনা করার অনুমতি দেন নি? বা তাদের পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টি ভঙ্গির বেড়াজাল এতই অধিক ছিল যে, চিন্তার আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঐ পর্দাকে উন্মোচন করে সত্যের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নাই।

নিশ্চয়ই কিছু লোক এমনও রহিয়াছেন যে, যাহারা এই আয়াতের শানে নুযূল-কে হযরত আলী (আঃ)-এর ব্যাপারেই খোলাখুলি ভাবে গ্রহণ করেছেন অথচ তারা এই কথাও প্রত্যাখ্যান করেন যে, এই আয়াত বেলায়েত ও খেলাফতের ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছে। আমরা এই আপত্তি ও উত্তরের বিষয়াবলী সামনে বর্ণনা করিব। ইনশাআল্লাহ!

অতএব, আমরা উপরে এমন কিছু বিষয়াবলী বর্ণনা করেছি যে, যা আহলে তাশাইয়্যুগণের কিতাবে উক্ত বিষয়ে এভাবে আলোচনাই করা হয়নি। বরং আহলে সুন্নাতগণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এত অসংখ্য রাওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনভাবেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং খুব হালকা ভাবে দেখার সুযোগও নেই।

আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না যে, কোরআনুল কারীমে অন্য যে কোন

আয়াতের শানে নুযূলে তো দুই একটি হাদীস বর্ণনা করেই যথেষ্ট ধরে নেওয়া হয়েছে! অথচ এই আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকেও কেন যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে না? এই আয়াত খানি কি এমন কোন বিশেষত্বের অধিকারী যা অন্যান্য আয়াতে পাওয়া যায় না? এবং এই আয়াতের ব্যাপারে এমন কোন সাংঘাতিক রহস্য লুকায়িত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কি?

দ্বিতীয় যে কথাটি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী যে, আমরা উপরে যে সকল রাওয়ায়েত বর্ণনা করে এসেছি উহাতো মাত্র ঐ বর্ণনারই সন্নিবেশ। যা ছিল কিনা এই আয়াতে হযরত আলী (আঃ)-এর শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে উপস্থিত করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণের পর্যালোচনা

এমন অসংখ্য বর্ণনা এই ব্যাপারে উপস্থিত করা হয়েছে যা কিনা প্রত্যেকেই এই ঘটনা প্রবাহকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারপর ভিন্ন ভিন্ন স্থরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কতিপয় রাওয়ায়েত রয়েছে অনেক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ও সুদীর্ঘ, আবার কতিপয় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মৌলিক, আবার কতিপয় বর্ণনায় এই ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে আলোকপাত করেছেন যে অন্য বর্ণনায় এই ঘটনাকে ভিন্ন রীতিতে আলোকপাত করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনাসমূহের সন্নিবেশ, কোরআন ও হাদীস, ইসলামী ইতিহাস এবং ঘটনার অবস্থানগত বিশ্লেষণে এই ঘটনাই সামনে আসে যে-

নবী (সাঃ)-এর জীবনের একেবারেই সর্বশেষ বৎসর, বিদায় হজ্জে বর্ণনাকৃত বিধানাবলী যেরূপ জাঁকজমক হয়েছিল ঠিক তদ্রুপ নবী (সাঃ)-কে ভালবাসার উপর সন্তুষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকের অন্তরই আনন্দে বিহ্বল ছিল যে, এখন উহাদের অন্তর ঐ মহান ইবাদতের মৌলিক স্বাদ আস্বাদন হওয়ার উপর অবস্থান করিতে ছিল। অসংখ্য আছহাবে রাসূল- ঐতিহাসিকদের মতে যার সংখ্যা প্রায় ১লক্ষ ২৪ হাজার।

হিজরী দশম বৎসর। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, কুরবানীর ঈদের পর মাত্র আট দিন অতিবাহিত হয়েছিল। হজ্জ সমাপনান্তে আল্লাহ্‌র নবী সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন মদীনার দিকে, হঠাৎ নবী (সাঃ)-এর পক্ষ হতে তাঁর আসহাবদের যাত্রা বিরতির নির্দেশ প্রদান করা হলো। লোকেরা উচ্চ স্বরে ঐ সকল লোকদেরকে ফিরে আসতে বললেন, যারা কাফেলার অগ্রবর্তীতে চলছিল এবং অতক্ষণের জন্য অপেক্ষা করলেন যতক্ষণে পিছনে পড়া লোকেরাও একত্রে মিলিত হতে পারে। সূর্য অর্ধদিবস অতিক্রম করেছিল। তখন নবী (দঃ) এর মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার আযানের মাধ্যমে লোকদের জোহরের নামাযের আহ্‌বান জানালেন। অতি দ্রুত মুসলমানরা নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপের প্রখরতা এতই বেশী ছিল যে, অনেকেই সহ্য সীমার অক্ষমতার কারণে তাঁদের আবা-এর অংশ বিশেষ পায়ের নীচে ও অংশ বিশেষ মাথার উপর উঠিয়ে নিল। কেননা গরমের প্রখরতা এবং সূর্যের তীক্ষ্ম রশ্মী তাঁদের মাথা ও পায়ের জন্য অসহনীয় ছিল। এই মরুভূমিতে কোন ছায়াবান বস্তু ছিল না, এমনকি মাটিতে কোন সবুজ ঘাঁসও ছিল না শুধু কতিপয় মৃত গাছ ঠায় দাড়িয়ে যেন গরমের সাথে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। কতিপয় লোক ঐ সকল বৃক্ষাদির ছায়ার আশ্রয় নিয়েছিল। আর নবীজি (সাঃ)-কে ছায়া দেয়ার জন্য ডালপালা যুক্ত গাছের সাথে কাপড় বাঁধা হয়েছিল। সকলেই চাচ্ছিল সূর্যের প্রখর তাপ হতে ছায়ার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিতে। ইতিমধ্যে যোহরের নামায আদায় করা হলো মুসলমানগণ শীঘ্রই তাঁদের সাথে নিয়ে আসা ছোট ছোট তাবুগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার মনস্থির করলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তাদের সকলের সামনে হাজির হয়েছেন। আর তেমনি সকলেই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসা নতুন পয়গাম শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তথায় একটি বিস্তারিত ভাষণও তিনি পেশ করলেন।

লোকেরা রাসূল (সাঃ)-এর নূরানী চেহারা মুবারক দূর থেকে যাতে দেখতে পারেন এবং এই আজিমুশ্বান মহাসমাবেশে দূর থেকে স্পষ্টভাবে

দেখতে পাচ্ছিলেন না এ কারণেই উটে পিঠের উপর মঞ্চ তৈরী করা হলো, আর নবীজি তাতে আরোহণ করলেন।

সর্ব প্রথমে হাম্‌দে বারি তা'য়ালা পেশ করলেন ; অতঃপর খোদার উপর ভরসা করে এই খোৎবা পেশ করলেন ঃ আমি অতি শীঘ্রই পরওয়ার দেগারের আহবানে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়ে তোমাদের মধ্য হতে চলে যাবো। আমাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তোমরা আমার সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দিবে? লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো نشهد إنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই রিসালতের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সু-সম্পন্ন করেছেন ও পৌছিয়েছেন। আর আমাদেরকে বহু কষ্ঠ স্বীকার করে হেদায়েতের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে এর শুভ প্রতিদানে ভূষিত করুন। অতঃপর তিনি আরো এরশাদ করলেন! হে লোকেরা তোমরা কি আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, আমার রিসালতের এবং কিয়ামত দিবসের সত্যতা ও সেই দিন মৃতদের পূনরুত্থানের সাক্ষী দিবে না ? সকলেই বললেন, কেন দেবো না হ্যাঁ আমরা সকলেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তিনি বললেন ; হে ! আল্লাহ্ সাক্ষী থেকো।

তিনি আরো বললেন ; হে লোক সকল, তোমরা কি আমার কণ্ঠ শুনতে পাও ?

তারা সকলেই বললেন ! জি হ্যাঁ।

এরপর সারা মরুভূমি নিশ্চুপ নিথর ও নীরবতার এমনি এক নিদারুণ করুণ দৃশ্যের আবির্ভাব সৃষ্টি হলো, যেখানে শুধু বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দই শুনা যাচ্ছিল। নবী (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দেখ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী বস্তু স্মৃতি স্বরূপ রেখে যাচ্ছি, তোমরা এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে ?

উপস্থিত জন সমুদ্রের মধ্য হতে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো; ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই ভারী বস্তু দু'টি কোন জিনিস? নবীজি এরশাদ করেন; প্রথম বস্তু হলো, আল্লাহ্‌র কিতাব- যাহা ওজনের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। উহার এক মাথা আল্লাহ্‌র হাতে অন্য মাথা তোমাদের হাতে রয়েছে। উহা হতে হস্ত সংবরণ

করবেনা কেননা হাত সরালেই তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ভারী বস্তুটি আমার স্মৃতির পতাকাবাহী– পবিত্র আহ্লে বায়েত এবং আল্লাহ লাতিফুল খাবির আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দু'টি বস্তু একে অন্যের থেকে বেহেস্তে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পৃথক হবে না।

ঐ দু'টি ধারা থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা এবং তাঁদের পশ্চাৎপদ হয়ে যাওয়া তোমাদের ধ্বংসের অনিবার্য কারণ হবে।

নিথর, নিঃস্তব্ধ জনতা দেখতে পেল নবীজি হঠাৎ এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন মনে হয় যেন তিনি কোন হারানো বস্তুকে খুঁজে ফিরছেন। যখনই তাঁহার দৃষ্টি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) এর উপর নিপতিত হলো তৎক্ষণাৎ তিনি আলী'র হস্ত ধারণ করে অতটুকু উর্দ্ধে তুলে ধরলেন যে, যাতে দুই বগলের শুভ্র কেশরাজি দেখা যাচ্ছিল। আর উপস্থিত জনতা দেখেই চিনে ফেললো। বললো, এতো ইসলামের সেই সিপাহসালার যাকে কখনো পরাজয়ের গ্লানি স্পর্শ করতে পারেনি। এ সময় হযরত (সাঃ) আরো সু-উচ্চ আওয়াজে, দৃপ্ত কণ্ঠে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন একটি ঘোষণা; হে লোক সকল! ايها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم-কে সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত মো'মেনিনদের উপর তাদের নিজেদের চেয়ে অত্যাধিক অধিকার রাখে? সমস্বরে সকলেই বলে উঠলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে অধিক জানেন!

অতঃপর নবীজি (সাঃ) এরশাদ করেন; আল্লাহ আমার মাওলা ও রাহবার, আমি মোমেনিনদের মাওলা ও রাহবার এবং তাদের প্রত্যেকের উপর তাদের নিজেদের চেয়ে তাদের উপর আমার অধিকার সবচেয়ে বেশী (এবং আমার ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত তাঁদের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার রয়েছে।)

এরপর এরশাদ ;

فمن كنت مولاه فعلى مولاه،

অর্থাৎ আমি যাদের যাদের মাওলা হিসাবে অধিষ্ঠিত রয়েছি আলীও তাদের তাদের মাওলা ও রাহবার হিসাবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

পয়গাম্বরে ইসলাম এই বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করেছেন এবং বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী এই বাক্যটি চার বার উচ্চারণ করেছেন এবং এরপর আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন ঃ

اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار -

অর্থাৎ "হে বারে এলাহী! যে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রেখো এবং যে তার সাথে দুশমনী করবে তুমিও তাকে দুশমন জেনো, যে তার সাথে ভালবাসা স্থাপন করে তুমিও তাকে ভালবাস, যে তার সাথে শত্রুতা ভাবাপন্ন হয় তুমিও তাকে শত্রুই জেনো, যে তাকে সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য করো, যে তার সহযোগিতা থেকে পাশ কাটিয়ে যায় এমন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখ এবং হক-কে সেদিকে ফিরিয়ে দাও যে দিকে সে মুখ ফিরায়।"

এরপর ঘোষণা করলেন ঃ الافليبلغ الشاهد الغائب। অর্থাৎ উপস্থিত জনতা এই কথা প্রচারের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে যাও। যারা আজকের এই দিনে এই সময়ে এই জন সমুদ্রে উপস্থিত নাই তাদের নিকট আমার এই মহান বাণী পৌঁছে দাও। এই বলে নবীজি (সাঃ) খুৎবা শেষ করলেন।

নবীজির সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল, হযরত আলী (আঃ)-ও ঘামে বিধৌত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সমগ্র উপস্থিত জনতারও ন্যাড়া মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘাম ঝরতে ছিল। এখনো এই মহাসমাবেশের উপস্থিত জনতা একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যান নি, ইত্যবসরে হযরত জিব্রাইল আমিন দ্বীনের পূর্ণতার আয়াত সম্বলিত সু-সংবাদের বাণী নিয়ে ইসলামের নবীর শেষ সমাবেশে অবতরণ করলেন ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ... الخ

"আজকের এই দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম...।"

নেয়ামতের পরিপূর্ণতা শুনে নবী পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

الله أكبر الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب
برسالتي والولاية لعلي من بعدي

অর্থাৎ সর্ববিদ শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যে, যিনি তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতার ঘোষণা দিলেন এবং তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলেন। তিনি আমার নবুয়ত ও রিসালাত এবং আমার পর আলীর বেলায়েত এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আমিরুল মো'মেনিন আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)-এর বেলায়েতের ঘোষণা নবী পাক (সাঃ)-এর জবান থেকে শ্রবণ করার পর উপস্থিত জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং অভিবাদন জানানোর জন্য শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা হযরত আলী (আঃ)-কে এই মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ায় নিজ নিজ পক্ষ থেকেও অভিবাদন জানাতে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এসেছিলেন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরও এই বাক্য দ্বারা মুবারকবাদ জানালেন যাহা আজো ইতিহাসের পাতায় কালের সাক্ষী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাঁরা বলেছেন ঃ

بخ بخ لك يا ابن ابي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل
مؤمن ومؤمنة

অর্থাৎ ধন্য ধন্য হে আবু তালিবের সন্তান, আপনি আজ থেকে আমাদের ও সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও নারীদের মাওলা এবং রাহবার-এর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

ইত্যবসরে হযরত ইবনে আব্বাস বলে উঠলেন 'হে খোদা এই অঙ্গিকার ও ফরমান সকলের ঘাড়েই বর্তাবে ও দায়িত্ব কর্তব্য অনাগত সভ্যতার জন্য বাকী রহিল।'

এ সময় আরবের প্রসিদ্ধ কবি– বিশেষ করে রাসূল (সাঃ)-এর সভা কবি

হাস্‌সান বিন ছাবিত নবী পাক (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি চেয়ে এই সুযোগে চলমান ঘটনাবলীর উপর একটি কাব্য রচনা করে পাঠ করলেন যার প্রারম্ভিক অমৃত সুধাগুলো এই ঃ

يناديهم يوم الغدير نبيهم + بخم واسمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم ونبيكم + فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

الهك مولانا وانت نبينا + ولم تلق منا في الولاية عاصيا

فقال له قم ياعلى فانني + رضيتك من بعدى اماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه + فكونوا له اتباع صدق مواليا

هناك دعا اللّهم وال وليه + وكن للذي عادا عليا معاديا

অর্থাৎ "পয়গাম্বরে ইসলাম গাদীরের দিন খুম নামক স্থানে তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন আর বলে ছিলেন এই আহ্বানকারীর সম্মান কেমন হওয়া উচিত এবং তোমাদের মাওলা ও নবী কে?

-তারা সবাই বললো যে, 'আপনার খোদা আমাদের মাওলা আর আপনি আমাদের নবী ও রাসূল। আমি আপনার বেলায়েতকে কবুল করলাম আর আমি এই বেলায়েত হতে মুখ ফেরাবোনা।'

-পয়গাম্বরে ইসলাম হযরত আলীকে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে যাও। কেননা আমি তোমাকে ইমাম ও রাহবার নির্বাচন করেছি।

-এরপর বললেন, যে ব্যক্তির আমি মাওলা ও রাহ্‌বার এই আলীও তার মাওলা ও রাহ্‌বার। অতএব তোমরা সততার সাথে তাঁকে অনুসরণ করবে।

-এই সময় পয়গাম্বর (সাঃ) বললেন, 'রাব্বুল আলামীন! এর (আলীর) বন্ধুকে বন্ধু এবং দুশমনকে দুশমন হিসেবে শামিল কর'।"

আমিরুল মো'মেনিন আলী ইবনে আবী তালিবের (আঃ) বেলায়েতের ঘোষণা পায়গাম্বর (সাঃ)-এর মুখে শুনে মোবারকবাদের হট্টগোল শুনা গেল।

ইহা হলো হাদীসে গাদীর যাহা আহলে সুন্নাত ও আহলে তাশাইউদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পারস্পরিক মত বিরোধের কারণ পর্যালোচনা ও অভিযোগ খন্ডন

এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, আলোচ্য এই আয়াতটি হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে! অতএব আমার পূর্ববর্তী বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এবং স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে নিহিত কারণাদি/নিদর্শনাদির সামান্যতম একটি প্রমাণকেও যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামের বড় বড় মুফাস্‌সিরিনে কেরাম আলোচ্য আয়াতে নিহিত ব্যাখার এক দশমাংশের চেয়েও কম গ্রহণ করতো! কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এখানে মত বিরোধের প্রাচীর ভেদ করে এই মহা সত্য গ্রহণ থেকে বহু দূরে সরে যাওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

যে সকল লোক এই আয়াতের তাফসীর, অসংখ্য বর্ণনার (যা এর শানে নুযুলে বর্ণিত) বিষয়ে মত বিরোধ করেছেন এবং এই ধারাবাহিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে ঐ সকল বর্ণনাগুলোর বিরোধিতায় বিরোধিতার জ্ঞানই জাহির করেছেন, যা কি না মূলতঃ গাদির সংশ্লিষ্টই ছিল, তারা দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ ঐ সকল লোক যারা শুরু থেকেই শুধুই শক্রুতা ও হটকারীতা বশতঃ এই বিষয়ে বিতর্ক করতো বরং তাহারা শিয়াদের ঘৃণা চোখে দেখেছেন, তাদের বদনাম করেছেন ও তাদের হত্যা করার কাজ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ঐ সকল লোক যাহারা সত্য অনুধাবনের বিষয়টি অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন এবং এ লোকেরা সত্যের নিগুঢ় রহস্যের শেষ সীমা পর্যন্ত

পৌঁছে গিয়েছিলেন, অতএব তাঁহারা দলিল প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে নিজেরাই নিজেদের রাস্তা করে নিয়েছেন। এই ভিত্তিতেই তাহারা সত্যের বিশেষ এক অংশকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাহারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথম থেকেই এই আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যার সাথে বিশেষ কিছু সমস্যাদির সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর ঐ সকল সমস্যাগুলোর ফলাফলই হলো আজকের চলমান বিশ্বের কর্মকান্ড যার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছেন তাহাদের ফেরকার অনুসারীরা।

প্রথম দলের উদাহরণ হলো ইবনে তাইমিয়াহ। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মিনহাজুস সুন্নাহ'-তে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উহাতে তিনি ঐ ব্যক্তির মত অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে স্বীয় চক্ষু বন্ধ করল, স্বীয় আঙ্গুল সজোরে কানে ঠেসে ধরল ও চিৎকার করে বলতে লাগলো সূর্য্য কোথায়; সূর্য নেই।" সে বাস্তবতাকে এমন কি দেখার জন্য এক চোখের একটি কোণ্ খুলতেও রাযী নয় এবং এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনদের এতদ্সংক্রান্ত ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনার অংশবিশেষ শোনার জন্যে কান থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নিতেও প্রস্তুত নয়। গালি দেয়া ও অবমাননা করাই এদের আসল কাজ। এই জেহালত বা অজ্ঞতা, বেখবরী, হটকারীতা ও বিরোধিতা বশত: ঘৃণার কারণে এতই অসহায় হয়ে পড়েছে যে, এমন অকাট্য বিষয়াবলীকেও তার অনুসারীরা অস্বীকার করে বসে আছে, যা কি না যে কোন সাধারণ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং এমন ব্যক্তিবর্গের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে কষ্ট দিতে চাই না এবং জবাব পড়ার কষ্ট পাঠকদের দিতে চাই না। কেননা আহলুস সুন্নাহ-র বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও মুফাস্সিরিনে কেরামগণ যারা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে 'এই আয়াত হযরত আলী (আঃ)-এর শানে নাযিল হয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাদের বিপরীতে নির্লজ্জভাবে বলে যে, উহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি এমন কোন জিনিস স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এমন লোকদের সম্পর্কে আমি কি বলবো, এ ধরনের ব্যক্তির কথার কি মূল্য আছে? যার উপর আমরা আলোচনা

করতে পারি।

আসল কথা হচ্ছে, 'ইবনে তাইমিয়্যাহ' এমন অসংখ্য মু'তাবার কিতাবের বিরোধিতা করেছেন যাতে এই আয়াত হযরত আলী (আঃ)-এর শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে , নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তিনি এই হাস্যকর আক্রমণাত্মক লাফালাফি করেই শেষ করেছেন।

উলামাদের মধ্যে যারা এটা বুঝেন যে, ইবনে তাইমিয়া কি বলেছেন, তারা কেহই এই আয়াত হযরত আলীর উপর নাযিল হয়েছে বলে কেবল তারাই এটা জানেন না।

ইবনে তাইমিয়ার উক্তি থেকে মনে হয় যে, তার মতে কেবল সেই মনীষীরাই জানেন যে, তিনি কি বলেছেন। যারা ইবনে তাইমিয়ার হিংসা পরায়ণ, একগুঁয়েমী চরমপন্থী মানসিকতা ও মতামতের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করবেন।

বস্তুতঃ কেবল ঐ ধরনের লোকেরাই এরূপ দাবী করতে পারে যাদের বিচার বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনার ওপর স্বার্থপরতা, অন্ধ বিদ্বেষ, অহংকার ও এক গুঁয়েমি ছায়াপাত করে আছে। তাই আমরা এ ধরনের লোকদের কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না।

তবে দ্বিতীয় ভাগের ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন ও যুক্তি তর্ক পেশ করেছেন। তার মধ্যে থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

এক. 'মাওলা' মানে কি চূড়ান্ত শাসনকর্তা ?

গাদীরে খুমের হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় তা হচ্ছে "মাওলা" শব্দ 'শাসনকর্তা' অর্থে গ্রহণ করা সম্পর্কে। আপত্তি কারীদের মতে, যেহেতু 'মাওলা' শব্দের অন্যতম অর্থ হচ্ছে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক ও সাহায্যকারী, সেহেতু এটা নিশ্চিত করে বলা চলে না যে, এ হাদীসে 'মাওলা' শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'শাসনকর্তা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ যুক্তির জবাব মোটেই জটিল নয়। কারণ যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ও গবেষকই স্বীকার করবেন যে, হযরত আলী (আঃ) মুসলমানদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক ও সাহায্যকারী- এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে এমন ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল না। যেভাবে শক্ত ও উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে কাফেলাকে থামিয়ে দেয়া হয় ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়, জনসমষ্টির মধ্য থেকে একের পর এক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় এতসব আনুষ্ঠানিকতা নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কারণ মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি ইসলামের সুস্পষ্টতম বিষয় সমূহের অন্যতম এবং ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই এ বিষয়টি একান্তভাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছিল। অতএব, এটা এমন কোন বিষয় ছিল না হযরত নবী করীম (সা) যা ঐ সময় পর্যন্ত প্রচার করেন নি। তেমনি এটি এমন কোন বিষয় ছিল না যা প্রকাশ করতে গিয়ে হযরত নবী করীম (সাঃ) ভয় পেতে পারেন যে কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে লোকদের (রোষানল) হতে রক্ষার জন্য আশ্বস্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। তেমনি আলী (আঃ) মুসলমানদের বন্ধু- এ বিষয়টি সবাইকে জানানো, এতখানি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তা মানুষের মধ্যে প্রচার না করলে রিসালাতের প্রচার না করার শামিল বলে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হতে পারে।

এসব থেকে সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সাধারণ ও সার্বজনীন অর্থে বন্ধুত্বের ঘোষণা নয় যা ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা ও আচরণে বিদ্যমান ছিল।

এতদ্সত্ত্বেও এখানে যদি সাধারণ অর্থে বন্ধুত্বই উদ্দেশ্য হবে তাহলে হযরত নবী কারীম (সাঃ) এ বিষয়ে ঘোষণা প্রদানের পূর্বে উপস্থিত জনতার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন কেন? তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

السست اولى بكم من انفسكم؟

"আমি কি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের তুলনায় অধিকতর অগ্রাধিকারী নই ?" সাধারণ অর্থে বন্ধুত্বের ঘোষণা প্রদানের সাথে এ বাক্যের কোন সম্পর্ক ও সমন্বয় থাকতে পারে কি?

তেমনি এটা সাধারণ বন্ধুত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা হলে এ জন্য হযরত ওমর যে ভাবে ও যে ভাষায় হযরত আলী (আঃ)-কে অভিনন্দন জানান তা খুবই বেখাপ্পা ও অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে। কারণ হযরত নবী কারীম (সাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (আঃ)-কে সকল মুসলমানের 'মাওলা' বলে ঘোষণা করার পর হযরত ওমর, হযরত আলী (আঃ)-কে এই বলে অভিনন্দন জানান ঃ

اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة

"আপনি আমার 'মাওলা' হলেন এবং প্রতিটি মু'মিন নর-নারীর 'মাওলা' হলেন।" বস্তুতঃ তিনি এ বিষয়টিকে হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য একটি নতুন ও বিরাট মর্যাদার বিষয় হিসেবে দেখেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঐদিন পর্যন্ত হযরত আলী (আঃ) কি একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে পরিগণিত ছিলেন, না যার সাথে বন্ধুর সম্পর্ক সকলের জন্য জরুরী ছিল না অথচ সকলের তা জানা ছিল না? না কি মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের বিষয়টি একটি নতুন বিষয় ছিল যা হযরত নবী কারীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মাস আগে প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন হয়?

তাছাড়া হযরত নবী কারীম (সাঃ)-এর বিদায় এবং সে প্রসঙ্গে হাদীসে সাক্বালাইন এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে; গাদীরে খুমে হযরত আলী (আঃ)-কে মুসলমানদের মাওলা বলে যে ঘোষণা দেয়া হয় তা একই সূত্রে গাঁথা বলে মনে হয়। মু'মিনদের সাথে হযরত আলীর সাধারণ বন্ধুত্বের দাবী এ নয় যে, তাঁকে কুরআন মজীদের পাশে স্থান দেয়া হবে।

এ থেকে যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের নিকটই কি এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না যে, হাদিসে সাকালাইন ও গাদীরে খুমের হাদীসে পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে? এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কুরআনে মজীদ ও আহলে বাইতের (আঃ) মু'মিনদের জন্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

দুই ঃ আয়ত সমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক

কেউ কেউ বলতে চান, যেহেতু আলাচ্য আয়াতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে আহ্‌লে কিতাবের নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর সম্পর্কের বিচারে মধ্য খানের এ আয়াতকে হযরত আলী (আঃ) এর-বেলায়েত ও শাসন কর্তৃত্ব সংক্রান্ত বলে মনে করা চলে না। বিশেষ করে তাফসীর গ্রন্থ 'আল-মানার' -এ (৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪৬৬) এ ব্যাপারে খুবই জোড় দেয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের আপত্তির কোন গুরুত্ব নেই। কারণ প্রথমতঃ আলোচ্য আয়াতের বাচনভঙ্গি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত সমূহের বাচনভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এ পার্থক্য খুব সহজেও ধরা পড়ে । এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ কুরআন মজীদ ক্লাসিক ধরনের কোন গ্রন্থ নয় যে, তার বিভিন্ন খন্ড ও অধ্যায়ে তার বিষয়বস্তু সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে সন্নিবেশিত থাকবে। বরং কুরআন মজিদের সূরাহ ও আয়াত সমূহ বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে ও বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে নাযিল হয়েছে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন মজিদ যেখানে কোন একটি যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছে ঠিক সেখানেই, উদাহরণস্বরূপ, একটি শাখাগত বিধান পেশ করছে। তেমনি কুরআন মজিদ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে কথা বলতে বলতে সহসাই মুসলমানদের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করছে এবং তাদের জন্য ইসলামের কোন বিধান বর্ণনা করছে। অতএব, তাদের এ প্রশ্ন তোলার যৌক্তিকতা

নেই।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, অন্ধ চিন্তার অনুসারীরা অত্যন্ত জোরের সাথে দাবী করছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর তাঁর নবুয়াতী জিন্দেগীর শুরুর দিকে পবিত্র মক্কা আল-মুকার্‌রামায় নাযিল হয়েছিল, যদিও তাঁরা জানেন যে, সূরাহ আল-মায়েদা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে পবিত্র মদিনা আল-মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে। তাঁরা হয়তো দাবী করবেন যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুয়াতে অভিষিক্ত হবার পর প্রথম দিকে নাযিল হলেও বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে আয়াতটিকে সূরাহ আল-মায়েদার মধ্যখানে স্থান দেয়া হয়েছে। এ দাবীর জবাবে বলবো, এখানে বরং তাঁদের দাবীর বিপরীত সত্যই প্রমাণিত হয়। কারণ এটা সর্বজন বিদিত যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার পর প্রথম দিকে তাঁকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মোকাবিলা করতে হয়নি। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতটি মক্কা আল-মুকার্‌রামায় নাযিল হয় নি এবং আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত সমূহের সাথে আয়াতটির শানে নুযুলগত কোন সম্পর্কও নেই।

এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি অন্ধত্ব ও গোঁড়ামির ঝড়ঝঞ্ঝার শিকার হয়েছে এবং এ কারণেও আয়াতটি সম্বন্ধে এমন সব সম্ভাবনার কথা উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, সম্পর্কে এ আয়াতটিতে বা অনুরূপ অন্য কোন আয়াতে কিছুই বলা হয়নি। তাই এসব লোকদের প্রত্যেকেই ভিত্তিহীন বাহানার আশ্রয় নিয়ে আয়াতটির মূল লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে নিজ নিজ সুবিধামত এর ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে চলেছেন।

তিনঃ হাদীছটি কি সব ছহীহ হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে ?

কেউ কেউ বলেন; বোখারী ও মুসলিম যখন তাঁদের হাদীস সংকলনে এ হাদীসটিকে স্থান দেননি তখন আমরা কি করে এটিকে গ্রহণ করতে পারি?

এ-ও-এক বিস্ময়কর ধরনের আপত্তি। কারণ, প্রথমতঃ এমন বহু

নির্ভরযোগ্য সহীহ হাদীস রয়েছে যা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মনীষিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে যদিও তা বোখারী ও মুসলিমে স্থান পায়নি। অতএব, এটি এ ধরনের প্রথম হাদীস নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ও সহীহ্‌ হাদীস গ্রন্থ কি শুধু মাত্র বোখারী ও মুসলিম? সিহাহ সিত্তাহ'র কোন কোন গ্রন্থে, যেমন ঃ ইবনে মাজায় এ হাদীসটি স্থান পেয়েছে। এছাড়া 'মুসনাদে আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল'-এও হাদীসটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তেমনি হাকেম নিশাপুরী, ইবনে হাজার আসকালানী এবং যাহাবীর মত খ্যাতনামা মনীষিগণ যাদের গোঁড়ামীর বিষয়টিও সর্বজনবিদিত– এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদের বহু ধারাকেই সিহাহ্‌ সিত্তাহ বলে স্বীকার করেছেন। অতএব, অসম্ভব নয় যে, বোখারী ও মুসলিম তাঁদের সমকালীন বিশেষ দূষিত পরিবেশ ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে সমকালীন শাসকদের পছন্দের বিপরীত কিছু স্বীয় গ্রন্থে লিখতে বা সংকলিত করতে পারেন নি বা চাননি।

চার ঃ আলী (আঃ) ও আহ্‌লে বাইত এ হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করেন নি কেন ?

কোন কোন লোক বলেন, গাদীরে খুমের হাদীস যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হবে তাহলে স্বয়ং হযরত আলী (আঃ) তাঁর আহ্‌লে বায়েত ও সমর্থকগণ এ হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করেন নি কেন? হযরত আলী (আঃ) এর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করাই কি তাঁদের জন্যে উত্তম ছিল না?

এ আপত্তির উৎসও হচ্ছে হাদীস, ইতিহাস ও তাফসীর নির্বিশেষে ইসলামী গ্রন্থাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকা। কারণ আহ্‌লে সুন্নাতের মনীষীদের গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হযরত আলী (আঃ) , আহ্‌লে বায়েতের অন্যান্য ইমাম (আঃ)-গণ এবং তাদের সমর্থকগণ গাদীরে খুমের হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

স্বয়ং হযরত আলী (আঃ) কর্তৃক শূরা (হযরত ওমরের মনোনীত হযরত

ওসমানকে খলীফা নিয়োগের পরামর্শ সভা) দিবসে এ হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন প্রসঙ্গে খাতীব খাওয়ারেযমী হানাফী তাঁর লেখা 'মনাকিব'-এ আমের বিন্ ওয়াসেলাহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ "শূরা দিবসে আমি আলী (আঃ)-এর সাথে ঐ গৃহে ছিলাম এবং আমি আলী (আঃ)-কে শূরা সদস্যদের নিকট বলতে শুনলাম ঃ আমি আপনাদের সামনে এমন একটি দলীল (যুক্তি ও প্রমাণ) পেশ করছি আরব-আজম নির্বিশেষে কারো পক্ষেই যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আমার আগে আল্লাহ্র ওয়াহ্দাত (একত্ববাদ) এর ঘোষণা করেছেন? (এরপর তিনি রিসালাতের পরিবারের মর্যাদা সমূহের কথা একে একে উল্লেখ করলেন এবং এরপর বললেন ঃ) আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মধ্যে আমি ছাড়া এমন কেউ আছেন কি যার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وانصر من نصره ليبلغ الشاهد الغائب .

(আমি যার মাওলা অতঃপর আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! যে তার পৃষ্ঠপোষকতা করবে আপনি তার পৃষ্ঠপোকতা করুন, যে তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে আপনি তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করুন এবং যে তাঁকে সাহায্য করে আপনি তাঁকে সাহায্য করুন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট এই বিষয়টি পৌঁছে দেয়।) জবাবে সবাই বললো "না"। এই বর্ণনাটি হাম্ভীনী/হুমায়ূনী (حموينى) তাঁর ফারায়েদুস সেম্তীন (فرائد السمطين) গ্রন্থের ৫৮ তম অধ্যায়ে এবং ইবনে হাতেম তার দুররুন নাজিম ও দারে কুতনীতে এবং ইবনে উক্বদা ও ইবনে আবিল হাদিদ নাহাজুল বালাগার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, ফারায়েদুস সেম্তীন এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী হযরত ওসমানের যুগে হযরত আলী (আঃ) মসজিদে জনগণের সামনে

গাদীরে খুমের ঘটনার যুক্তি উপস্থাপন করেন। তেমনি কুফায়ও, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর অব্যবহিত পর তাঁর (আলীর) খলিফা হবার অধিকার অস্বীকার করছিল তাদের সামনে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় গাদীরে খুমের ঘটনাকে যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেন।

আল্লামা আমিনীর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-গাদীরের উদ্ধৃতি অনুযায়ী আহ্‌লে সুন্নাতের বিখ্যাত তথ্য সূত্র সমূহ চারজন সাহাবী ও চৌদ্দজন তাবেয়ী থেকে এ হাদীস উদ্ধৃতি করা হয়েছে।

তেমনি হাকেম-এর 'মুস্তাদরাকে সহীহাইনের'-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী জঙ্গে জামালের দিনে হযরত আলী (আঃ) তালহার সামনে গাদীরে খুমের ঘটনার যুক্তি উপস্থাপন করেন।

এ ছাড়া সালিম বিন কায়েস হেলালীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ছিফফিন যুদ্ধের দিনে হযরত আলী (আঃ) স্বীয় সৈন্য সমাবেশস্থলে একদল মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য লোকের সামনে গাদীরে খুমের হাদিসের যুক্তি উপস্থাপন করেন। তখন ১২ জন বদরী সাহাবী দাড়িয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা গাদীরে খুমের দিনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই কথা বলতে শুনেছেন।

হযরত আলী (আঃ) ছাড়াও হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (সালামুল্লাহে আলাইহা), হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম), আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, আম্মার ইবনে ইয়াসার, কায়েস বিন সা'দ, ওমর বিন আব্দুল আজিজ ও আব্বাসী খলিফা মামুন গাদীরে খুমের হাদীস-কে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এমনকি আমর ইবনুল আস মুয়াবিয়ার নিকট লিখিত পত্রে হযরত আলী (আঃ) ও মুয়াবিয়ার মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরার জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় গাদীরে খুমের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। খাতীবে খাওয়ারেযমী হানাফি তার 'মানাকেব' গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ করেছেন।

পাঁচ ঃ আয়াতের শেষ বাক্যের উদ্দেশ্যাবলী।

আরেকটি আপত্তি পেশ করা হয় এই বলে যে, আলোচ্য আয়াতে যদি

হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফত ও বেলায়েতের ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকবে এবং গাদীরে খুমের ঘটনায় যদি এই ঘোষণা প্রদান করা হয়ে থাকবে। তাহলে আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে যে বলা হয়েছে ان الله لايهدى القوم الكافرين (নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না।) হযরত আলী (আঃ) খেলাফত ও বেলায়েতের সাথে এই বাক্যের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

এই আপত্তির জবাবে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ যে, অভিধানে এবং একই ভাবে কোরআন মজিদে 'কাফির' কথাটি 'অস্বীকারকারী' বা' প্রত্যাখ্যানকারী, 'বিরোধিতা করা', পরিত্যাগ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো আল্লাহ তায়ালা বা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে বা উভয়কে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং কখনো আল্লাহ বা রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম মানতে অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে হজ্জ্ব সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ "আর যে (হজ্বের আদেশকে) উপেক্ষা করবে/অমান্য করবে। (সে জেনে রাখুক যে, এতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নেই, কারণ) অবশ্যই আল্লাহ জগৎ সমূহের অধিবাসীদের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত।" অন্য দিকে সূরা আল-বাকারা-র ১০২ নং আয়াতে জাদুকরদের সম্বন্ধে এবং যাদুর সাহায্যে নিজেদেরকে কলুষিত করেছে তাদের সম্পর্কে 'কুফর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر .

"তারা দু'জন কাউকেই যাদু শিক্ষা দিত না এই কথা না বলে যে, নিঃসন্দেহে আমরা হচ্ছি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব কুফুরী করো"– এ ছাড়া সূরা ইব্রাহিমের ২২ নং আয়াতে দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা অর্থে 'কুফর' শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আয়াত অনুযায়ী শেষ বিচারের দিনে শয়তান সুস্পষ্ট ভাষায় তার অনুসারীদের পাপাচারের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার

করবে। শয়তান তাদেরকে বলবে ঃ

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ

"ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতে আমি তা অস্বীকার করছি।"

অতএব সূরা আল-মায়েদার ৬৭ নং আয়াতের বেলায়েতের বিরোধিতা-কারীদের জন্য যদি 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ছয় ঃ একই সময় দুই জন শাসক সম্ভব কি ?

এ মোতাওয়াতির হাদীস এবং আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্যকে এড়িয়ে যাবার জন্য অপর যে বাহানার আশ্রয় নেয়া হয় তা হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যদি গাদীরে খুমের ঘটনায় হযরত আলী (আঃ) এর বেলায়েত ও খেলাফত ঘোষণা করে থাকেন তাহলে একই সময় দুই জন শাসক (ওয়ালী) থাকা অপরিহার্য্য হয়ে দাড়ায়। কারণ হযরত নবী করীম (সাঃ) পূর্ব থেকেই মুসলমানদের শাসক ছিলেন এবং হযরত আলী (আঃ)-কেও এক্ষণে শাসক হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল ও সংশ্লিষ্ট হাদিসের সময়কার বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর উক্তিতে নিহিত নিদর্শনাদি নিয়ে চিন্তা করলে অতঃপর এ বাহানার আর কোন সুযোগ থাকে না। কারণ আমরা জানি যে, এই ঘটনা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ইনতেকালের মাত্র কয়েকমাস আগের ঘটনা। এই সময় তিনি মুসলমানদের নিকট সর্বশেষ হুকুম আহকাম পৌঁছে দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছিলেন যে, হয়ত তাদের সাথে আর সাক্ষাত হবে না। অর্থাৎ তাঁর ইনতেকাল যে, সন্নিকটবর্তী তা তিনি জানতেন এবং এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য দু'টি মহামূল্যবান গুরুভার জিনিস রেখে যাচ্ছি। যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথ হারা হবে না...।"

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, যিনি এই ভাষায় কথা বলেন তিনি স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরসূরী নিয়োগ করছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। বর্তমান সময় অর্থাৎ নিজের সময়ের জন্য নয়। অতএব, এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, গাদীরে খুমের হাদীস থেকে একই সময় দুই শাসক ও দুই নেতার বিষয় প্রমাণিত হয় না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আহ্‌লে সুন্নাতের কতেক মনীষী যেখানে একই সময় দুই শাসকের যুক্তি তুলে আলোচ্য আয়াত ও গাদীরে খুমের ঘটনার সাথে হযরত আলী (আঃ)-এর বেলায়েত ও খেলাফতের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন, সেখানে আহ্‌লে সুন্নাতেরই অপর কতেক মনীষী এই সম্পৃক্ততা স্বীকার করেও এর ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা হচ্ছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী (আঃ)-এর শাসন কর্তৃত্বের (বেলায়েত) ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার তারিখ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেননি। অতএব, তিন খলিফার পরে তিনি চতুর্থ খলিফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় সমস্যা কোথায়?

সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার! কেউ এ প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন তো কেউ অপর প্রান্তে। অন্ধ ধারণা-বিশ্বাস সঠিক উপসংহারে উপনীত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, হযরত নবী (সাঃ) যদি পর পর চারজন খলিফা মনোনীত চেয়ে থাকবেন এবং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থেকে থাকবেন তাহলে তিনি গাদীরে খুমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফা মনোনীত না করে ৪র্থ খলিফা মনোনীত করলেন কেন? অথচ পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রথম খলিফা থেকে নিয়োগ দানই তো অধিকতর জরুরী ছিল।

উপসংহারে বলতে হয় যে, বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা পূর্ব অন্ধ ধারণার প্রভাবাধীন না হলে আলোচ্য আয়াত ও হাদীস সম্বন্ধে এ সব আপত্তি উত্থাপনের কোন কারণ থাকতে পারে না।

গাদীরের ভাষণ ঃ সনদের বর্ণনা।

গাদীরে খুম-এর হাদিসের ব্যাপারে প্রথম কথা হলো অধিকাংশ লোকই এই ব্যাপারে একেবারেই বেখবর! এমনকি আলেম শ্রেণীও, যারা নাকি মুফাস্সির হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন তারাও। আসল কথা বলতে কি প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বে থেকে চলে আসা প্রতিক্রিয়াশীল কিছু সংখ্যক কুচক্রীমহল এই বিষয়টিকে ছলে বলে কৌশলে আড়াল করার চেষ্টার কোনই ত্রুটি তারা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ কেউ যদি এই বিষয়ে কোন ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেন তাহলে ঐ সমস্ত উলামাবৃন্দ এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে বলেন 'দুর্বল', 'যইফ', 'মশহুর রেওয়ায়েত নাই', আর জ্ঞানপাপীরা বলেন যে, এতো শী'আদের কথা, ওরাতো কোরআনের তাহরিফে বিশ্বাস করে তাই ওরা ওদের কথিত ইমামদের নামে অদ্ভুত কিছু আয়াত বানিয়ে নিয়েছেন, যা কিনা কোরআন বা হাদিসের কোথাও নেই বা সাবায়ীদের (ইবনে সাবা) কথা।

মূল কথা সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারটিতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গও আপত্তি উত্থাপন করেন। আমি এখানে সেই সকল ব্যক্তিবর্গের চিন্তা শক্তিকে শাণিত করাতে ও বিশ্লেষণে সহায়তা করতে অত্র হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করছি। যাতে আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের নিরিখে বিচার করতে পারেন, রাসূল (সাঃ)-এর আসহাবে কেরামগণ তাদের প্রতি তোহমত থেকে হেফাজত থাকতে পারেন ও সর্বোপরি রাসূলের রেখে যাওয়া এমারতের আনুগত্যের পথের দিশা লাভ করে সত্যের আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারেন, আর সেই আলোর অমিয় সুধা অবগাহন করে জান্নাতবাসী হওয়ার একটা উছিলা খুঁজে পান।

এই হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন মহানবীর শীর্ষস্থানীয় ১১০ জন

সাহাবী যাদের জীবন চরিত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এমন কোন মাজহাব বা সম্প্রদায় ইসলামে আছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না।

তাই অত্র অধ্যায়ে সেই সকল মনীষীদের নাম, পিতার নামসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো যাতে আপনারা রিজাল শাস্ত্র থেকে তাঁদের জীবন চরিত অধ্যায়ন করে তাদের উপর হইতে অভিযোগের বোঝাটি অপসারণ করতে পারেন ঃ

প্রথমে রাসূল (সাঃ)-এর ছাহাবীদের নামের তালিকা

০০১. আবু হোরায়রাহ্ আদ-দাউসি;

০০২. আবু লায়লা আল আনসারী;

০০৩. আবু জায়নাব ইবনে আওয়াফ আল আনসারী;

০০৪. আবু ফাদালাহ আল আনসারী;

০০৫. আবু কুদামাহ্ আল আনসারী;

০০৬. আবু আমারাহ ইবনে আমর ইবনে মুহাসিন আল আনসারী;

০০৭. আবুল হায়সাম ইবনে আল তাইহান (তিনি সিফফিনে শহীদ হন);

০০৮. আবু রাফি আল কিবতী, (পবিত্র মহান বীর-ক্রীতদাস ছিলেন);

০০৯. আবু যুয়াইব খুআলিদ (বা খালিদ) ইবনে আল হুজালি (তিনি একজন কবি);

০১০. আবু বকর ইবনে আবি কুহাফাহ আল-তাঈমী (মুসলমানদের প্রথম খলিফা);

০১১. উসামাহ ইবনে জায়েদ ইবনে হারিসাহ আল ক্বালবী;

০১২. উবাই ইবনে কা'ব আল আনসারী (তিনি একজন ক্বারী);

০১৩. আসাদ ইবনে জুরারাহ আল আনসারী;

০১৪. আসমা বিনতে উমাইস আল খাসআমীআ;

০১৫. উম্মে সালমাহ, মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রী);

০১৬. উম্মে হানি বিনতে আবী তালিব (হযরত আলী [আঃ]-এর বোন);

০১৭. আবু হামজা আনাস ইবনে মালিক আল আনসারী আল খাযরাজী (নবী (সাঃ)-এর খাদেম);

০১৮. বারাআ ইবনে আযেব আল-আনসারী আল আওসী;

০১৯. বুরায়দা ইবনে আল হাছীব আল আসলামী;

০২০. আবু সাঈদ ছাবেত বিন ওয়াদিয়া আল-আনসারী আল খাযরাজী;

০২১. জাবির ইবনে সামুরা বিন জুনাদা আল সাওয়ায়ী;

০২২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী;

০২৩. জাবালা ইবনে আমর আল-আনসারী;

০২৪. জুবায়র ইবনে মুতঈম ইবনে আদী আল কুরাইশি আন নাওফলী;

০২৫. জারির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবের আল-বাজালী;

০২৬. আবু যর জুনদুব ইবনে জুনাদা আল-গিফারী;

০২৭. আবু জুনায়দা; যানদা ইবনে আমর ইবনে মাজুন আল-আনসারী;

০২৮. হাব্বাহ ইবনে জাওবীন আবু কুদামা আল আরানী আল বাজালী;

০২৯. হুবাশী ইবনে জুনাদা আল সুলূলী;

০৩০. হাবীব ইবনে বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকাহ আল খুজায়ী;

০৩১. হুযায়ফা ইবনে উসাইদ আবু সারিহা আল গিফারী;

০৩২. হুযায়ফা ইবনে আল-ইয়ামান আল ইয়ামানী;

০৩৩. হাস্সান ইবনে ছাবেত [আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর সভাকবি];

০৩৪. হাসান ইবনে আলী (আঃ) আল ইমাম আল মুজতাবা;

০৩৫. হুসায়ন ইবনে আলী (আঃ) আল ইমাম আশ-শহীদ;

০৩৬. আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মেজবান);

০৩৭. আবু সুলাইমান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আল মুগিরা আল মাখজুমী;

০৩৮. খুজায়মা ইবনে সাবেত আল আনসারী (যিনি দুই শাহাদাতের অধিকারী);

০৩৯. আবু শারীহ খুওয়াইলিদ ইবনে আমর আল খুজাঈ;

০৪০. রিফায়াহ ইবনে আবদুল মুনযির আল আনসারী;

০৪১. যুবায়ের ইবনে আল আওয়াম আল কুরাইশী (জঙ্গে জামালে নিহত);

০৪২. যায়েদ ইবনে আরক্বাম আল আনসারী আল খাযরাজী;

০৪৩. আবু সাঈদ যায়েদ ইবনে সাবেত;

০৪৪. যায়েদ-ইয়াজিদ ইবনে শুরাহিল আল আনসারী;

০৪৫. যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারী;

০৪৬. আবু ইসহাক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস;

০৪৭. সা'দ ইবনে আল উবাদা আল আনসারী আল খাযরাজী;

০৪৮. আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালেক আল আনসারী আল খুদরী;

০৪৯. সাঈদ ইবনে যায়েদ আল কুরাইশি আল আদুবী;

০৫০. সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা আল আনসারী;

০৫১. আবু আবদুল্লাহ সালমান আল ফারসী;

০৫২. আবু মুসলিম সালমা ইবনে আমর ইবনে আল আকওয়া আল আসলামী;

০৫৩. আবু সুলাইমান সামুরা ইবনে জুনদুব আল ফুজুরী আল আনসারী;

০৫৪. সাহল ইবনে হুনাইফ আল আনসারী আল আওসী;

০৫৫. আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আল আনসারী আল খাযরাজী;

০৫৬. আবু উমামা আল সা'দী ইবনে আজলান আল বাহেলী;

০৫৭. যুমায়রা আল আসাদী;

০৫৮. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আল তামীমী (জঙ্গে জামালে নিহত);

০৫৯. আমের ইবনে উমায়র আল নামেরী;

০৬০. আমর ইবনে লায়লা আল জুমারাহ;

০৬১. আমের ইবনে লায়লা আল গিফারী;

০৬২. আবু তুফায়েল আমের ইবনে উসালাতুল লাইসী;

০৬৩. আয়শা বিনতে আবু বকর ইবনে আবী কুহাফা (নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী);

০৬৪. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম (নবী (সাঃ)-এর চাচা);

০৬৫. আবদুর রহমান ইবনে আবুদুর রব আল আনসারী;

০৬৬. আবু মোহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবনে আউফ আল কুরাইশি আল জাহরী;

০৬৭. আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামর আল দাইনী;

০৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবী আবদুল্লাহ আল আসাদ আল মাখজুমী;

০৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে বাদিল ইবনে আরাকা (তিনি খুজাই গোত্রের নেতা ছিলেন);

০৭০. আবদুল্লাহ ইবনে বাশির আল মাজুনী;

০৭১. আবদুল্লাহ ইবনে ছাবেত আল আনছারী;

০৭২. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবী তালিব আল হাশেমী;

০৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব আল কুরাইশী আল মাখজুমী;

০৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে রাবীয়া;

০৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল কুরাইশী;

০৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা আল কামাহ আল আসলামী;

০৭৭. আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব আল আদুবী;

০৭৮. আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল হুজালী;

০৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়ামীল;

০৮০. উসমান ইবনে আফ্ফান (মুসলমানদের ৩য় খলিফা);

০৮১. উবায়দ ইবনে আযেব আল আনসারী (বারাআ ইবনে আযেবের ভাই);

০৮২. আবু ত্বারীফ আদী ইবনে হাতেম (তাঈ);

০৮৩. আতিয়্যা ইবনে বসর/বাশীর আল মাজুনী;

০৮৪. উক্ববাহ ইবনে আমের আল জুহনী;

০৮৫. আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালেব (আঃ) আল ইমাম আল মুরতাজা;

০৮৬. আবুল ইয়াক্বযান আম্মার ইবনে ইয়াসের আল উনাসী (সিফফীনের শহীদ);

০৮৭. আম্মারা আল খাজরাযী আল আনসারী;

০৮৮. উমর ইবনে আবী সালমা ইবনে আবদুল আসাদ আল মাখজুমী;

০৮৯. উমর ইবনে আল খাত্তাব (মুসলমানদের ২য় খলিফা);

০৯০. আবু নাজীদ এমরান ইবনে হুসায়ন আল খুযাঈ;

০৯১. আমর ইবনে হামাক্ব আল খুজাঈ; আল কুফী;

০৯২. আমর ইবনে শুরাহীল আদ্দী আল খাওয়ারেযমী;

০৯৩. আমর ইবনে আস;

০৯৪. আমর ইবনে মুররা আল জাহনী এবং আবু ত্বালহা ও আবু মারইয়াম;

০৯৫. আস্‌সিদ্দীকাতু ফাতেমাতুজ জাহ্‌রা (সা.আ.) নবী (সাঃ)-এর কন্যা;

০৯৬. ফাতেমা বিনতে হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী (সাঃ)-এর চাচাত বোন);

০৯৭. ক্বায়েস ইবনে সাবেত ইবনে শুমাস আল আনসারী;

০৯৮. ক্বায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ আল আনসারী আল খাযরাজী;

০৯৯. আবু মুহাম্মাদ কা'ব ইবনে আজরাহ আল আনসারী;

১০০. আবু সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ আল লাইছী;

১০১. আল মিক্বদাদ ইবনে আমর আল কিনদী আয যাহরী;

১০২. নাজিয়্যাহ ইবনে আমর আল খুজাঈ;

১০৩. আবু বারযাহ ফাদ্বলাহ ইবনে উতবাহ আল আসলামী;

১০৪. নু'মান ইবনে আজলান আল আনসারী;

১০৫. হাশেম আল মিরক্বাল ইবনে উতবাহ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আয যাহ্‌রী;

১০৬. আবু উসামাহ ওয়াহ্‌শী ইবনে হরব আল হাবশী আল হামসী;

১০৭. ওয়াহ্‌হাব ইবনে হামযাহ আদ্দী আল খাওয়ারিজমী;

১০৮. আবু জুহাইফাহ ওয়াহ্‌হাব ইবনে আবদুল্লাহ আস সুওয়াই;

১০৯. আবু মুরাযেম ইয়া'লী ইবনে মুররাহ ইবনে ওয়াহ্‌হাব আছ ছাক্বাফী;

(আল আমিনী ঃ আল-গাদীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ঃ ১৪-৬১; রাবীদের নাম)

উপরোক্ত সাহাবীদের নিকট হইতে এই হাদীস শুনে পুনরায় বর্ণনা করেছেন এমন তাবেঈন (সাহাবীদের শিষ্য)-এর সংখ্যা ৮৪ জনেরও অধিক। এক্ষেত্রেও ক্রমধারায় নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

তাবে'ঈগণের নামের তালিকা ঃ

০১. আবু রাশেদ আল হুবরানী আশ শামী;

০২. আবু সালমাহ ইবনে আবদির রাহমান ইবনে আওফ আয যাহ্‌রী;

০৩. আবু সুলাইমান আল মুয়াজ্জিন;

০৪. আবু সালিহ আস সাম্মান, যাকওয়ান আল মাদানী;

০৫. আবু উনফুয়ানা আল মাজিনি;

০৬. আবু আবদির রহিম আল কিন্দি;

০৭. আবুল কাসিম, আছবাগ ইবনে নুবাতাহ আত্-তামীমী আল কুফী;

০৮. আবু লায়লী আল-কিন্দি;

০৯. আইয়াস ইবনে নুযাইর;

১০. জামীল ইবনে আম্মারা;

১১. হারিসাহ ইবনে নাসর;

১২. হাবীব ইবনে আবী সাবিত আল আসাদী আল কুফী;

১৩. আল হারস ইবনে মালিক;

১৪. আল হুসাইন ইবনে মালেক ইবনে আল হুওয়াইরেস;

১৫. হিকাম বিন উতাইবাাহ আল-কুফী আলকিন্দী;

১৬. হুমাইদ বিন আম্মারা আল-খাযরাযী আল-আনসারী;

১৭. হুমাইদ আল তাবীল আবু উবায়দাহ ইবনে আবী হুমাইদ আল-বাসরী;

১৮. খায়ছামাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জুফী আল-কুফী;

১৯. রাবিয়া আল-জুরাসী;

২০. আবুল মুছান্না রিয়াহ বিন আল-হারেস আন-নাখয়ী আল-কুফী;

২১. আবু ওমর ওযাজান বিন উমর আলকিন্দী আল-বায্যার;

২২. আবু মরিয়ম যিররা;

২৩. যিয়াদ বিন আবী যিয়াদ;

২৪. যায়েদ বিন উসায়ে' আল-কুফী;

২৫. সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব আল-কুরাইশী আদুবী;

২৬. সাঈদ ইবনে জুবাইর আল-আসাদী আলকুফী;

২৭. সাঈদ ইবনে আবী হাদ্দাহ;

২৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব আল-কুরাইশী আল-মাখজুমী;

২৯. সাঈদ ইবনে ওহাব আল-হামদানী আল-কুফী;

৩০. আবু ইয়াহ্‌ইয়া সালমা ইবনে কাহীল আল-হাজরামী আল-কুফী;

৩১. আবু সাদেক সালিম ইবনে কায়েস আল-হেলালী;

৩২. আবু মুহাম্মদ সোলাইমান ইবনে মেহরান আল-আ'মাশ;

৩৩. সাহম ইবনেল হুছায়েন আল-আসাদী;

৩৪. শাহর ইবনে হাওশাব;

৩৫. আদ্দাহাক ইবনে মুজাহেম আল-হেলালী আবুল কাসেম;

৩৬. তাউস ইবনে কাইসান আল-ইয়ামানী আল-জান্দী;

৩৭. তালহা ইবনে আল-মুছারেরফ আল-আইয়ামী আল-কুফী;

৩৮. আমের ইবনে সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আল-মাদানী;

৩৯. আয়শা বিনতে সায়্যাদ;

৪০. আব্দুল হামিদ ইবনে মুনযের ইবনুল জারুদ আল-আবদী;

৪১. আবু আম্মারাহ আব্দে খায়ের ইবনে ইয়াযিদ আল-হামদানী আ-কুফী;

৪২. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা;

৪৩. আব্দুর রহমান ইবনে ছাবেত আল-মাক্কী;

৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আস'য়াদ ইবনে যারারা;

৪৫. আবু মরিয়ম আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল-আসাদী আল-কুফী;

৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে শারিক আল-আমেরী আল-কুফী;

৪৭. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল আল-হাশেমী মাদানী;

৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'লা ইবনে মুর্‌রা;

৪৯. আদী ইবনে ছাবেত আল-আনসারী আল-কুফী;

৫০. আবুল হাসান আতিয়্যাহ ইবনে সা'য়াদ ইবনে জুনাদ;

৫১. আলী ইবনে যায়েদ ইবনে যাদ'য়ান আল-বসরী;

৫২. আবু হারুন আম্মারা ইবনে জুয়াইন আল-আবদী;

৫৩. উমর ইবনে আব্দুল আজিজ আল-খালীফা;

৫৪. উমর ইবনে আব্দুল গাফ্‌ফার;

৫৫. উমর ইবনে আলী আল-আমিরিল মু'মেনীন (আঃ);

৫৬. উমর ইবনে যা'দাহ ইবনে হুবায়রা;

৫৭. উমর ইবনে মুররাহ আবু আব্দুল্লাহ আল-কুফী আল-হামদানী;

৫৮. আবু ইসহাক আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাবয়ী';

৫৯. আবু আব্দুল্লাহ আমর ইবনে মায়মুন;

৬০. উমায়রা ইবনে সা'দ আল-হামদানী আল-কুফী;

৬১. উমায়রা বিনতে সা'দ ইবনে মালেক আল-মাদানীয়াহ;

৬২. আইসী ইবনে তালহা উবায়দুল্লাহ আল-তামিমী আল-মাদানী;

৬৩. আবু বকর ফতর ইবনে খালিফাহ আল-মাখজুমী;

৬৪. কুবাইসাহ ইবনে যুয়াইব;

৬৫. আবু মারইয়াম কায়েস আস-সাকাফী আল-মাদায়েনী;

৬৬. মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আলী আল-আমিরিল মু'মেনীন (আঃ);

৬৭. আবুদ্দোহা মুসলিম ইবনে ছুবীহ আল-হামদানী আল-কুফী;

৬৮. মুসলিম আল-মুলায়ী;

৬৯. আবু জুরারা মুসয়াব ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আয-যাহরী আল-মাদানী;

৭০. মুতাল্লেব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কুরাইশী আল-মাখজুমী আল-মাদানী;

৭১. মুতার আল-ওর্‌রাক;

৭২. মা'য়রূফ ইবনে খুরবুজ;

৭৩. মানছুর ইবনে রাবীয়ী;

৭৪. মুহাজের ইবনে মুসাম্মার ইবনে জাহরী আল-মাদানী;

৭৫. মুসা ইবনে উক্তাল ইবনে উমায়ের আন-নুমায়েরী;

৭৬. আবু আব্দুল্লাহ মায়মুন আল-বাসরী;

৭৭. নাযির আয-যাবী আল-কুফী;

৭৮. হানী ইবনে হানী আল-হামদানী আল-কুফী;

৭৯. আবু বেল্লাজ ইয়াহ ইয়া ইবনে সালিম আল-ফাযারী;

৮০. ইয়াহ ইয়া ইবনে যা'দাহ ইবনে হুবায়রা আল-মাখযুমীন;

৮১. ইয়াযিদ ইবনে আামি যিয়াদ আল-কুফী;

৮২. ইয়াযিদ ইবনে হাইয়ান আত-তায়ীমী আল-কুফী;

৮৩. আবু দাউদ ইয়াযিদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-কুফী;

৮৪. আবু নাযিহ ইয়াসার আল-সাক্বাফী।

(পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৬২-৬৩)

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে– বর্ণনাকারীদের জীবনী সংরক্ষকরা এই হাদীসকে প্রতিটি শতকের প্রতিটি যুগের বর্ণনাক্রমে তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কিছু নামের তালিকা ঃ

১. আবু মুহাম্মদ, আমর ইবনে দিনার আল জুমাহী আল মাক্কী;

২. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ আল কুরাইশি আয-যাহরী;

৩. আবদুর রাহমান ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আত-তায়েমী আল মাদানী;

৪. বকর ইবনে সোয়াদাহ ইবনে ছুমামা, আবু ছুমামা আল বসরী ;

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবি নাজিহ, ইয়াসির আছ-ছাকিফি, আবু ইয়াসার আল মাক্কী ;

৬. আল হাফিজ মাঘিবাহ ইবনে মুকাসিম, আবু হিশাম আজ দাব্বী আল কুফী;

৭. আবু আবদির রাহিম খালিদ ইবনে জায়েদ আল জুমাহি আল মিসরী ;

৮. হাসান ইবনে আল হাকাম আল নাখায়ি আল কুফী ;

৯. ইদ্রিস ইবনে ইয়াজিদ, আবু আবদুল্লাহ আল আওয়াদি আল কুফী;

১০. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ ইবনে সাঈদ ইবনে হায়ান আত তায়েমী আল কুফী;

১১. আল হাফিজ আবদুল মালিক ইবনে আবি সুলায়মান আল আর জামী আল কুফী;

১২. আওয়াফ ইবনে আবি জামিলাহ আল আবদি আল হাজারি আল বাসরি;

১৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে হাফস ইবনে আসিম ইবনে উমর ইবনে আল খাত্তাব আল আদায়ী আল-মাদানী ;

১৪. নুয়াম ইবনে আল-হাকিম আল-মাদায়েনী ;

১৫. তালহা ইবনে ইয়াহয়া ইবনে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত-তায়েমী আল কুফী ;

১৬. আবু মুহাম্মদ ইবনে জায়েদ আল আসলামী ;

১৭. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল-মাদানী ;

১৮. আল হাফিজ মুয়াম্মার ইবনে রশিদ, আবু উরওয়াহ আল আজাদি আল বশরী ;

১৯. আল হাফিজ মিশার ইবনে খিদাম ইবনে জহির আল হিলালী আর রাওয়াসি আল কুফী ;

২০. আবু ঈসা আল-হাকাম ইবনে আবান আল আদনি ;

২১. আবদুল্লাহ ইবনে শাযাব আল বালখী আল বসরী ;

২২. আল হাফিজ শো'বাহ ইবনে আল হাজ্জাজ আবু বোস্তাম আল ওয়াসাতি

২৩. আল হাফিজ আবুল আলা, কামিল ইবনে আলা আত-তামিমি আল কুফী

২৪. আল হাফিজ সুফিয়ান ইবনে সাইদ আছ-ছাওরী, আবু আবদিল্লাহ আল কুফী;

২৫. আল হাফিজ ইসরাইল ইবনে ইউনুস ইবনে আবি ইসহাক আস-সাবয়ী, আবু ইউসুফ আল কুফী

২৬. জাফর ইবনে জিয়াদ আল কুফী আর আহমার ;

২৭. মুসলিম ইবনে সারিম আল নাহদী, আবু ফারাহ আল কুফী;

২৮. আল হাফিজ কায়েস ইবনে আর রাবি, আবু মুহাম্মদ আল আসাদী আল কুফী ;

২৯. আল হাফিজ হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, আবু সালামাহ আল বসরী (১৬৭);

৩০. আল হাফিজ আবদুল্লাহ ইবনে লাহিআহ. আবু আবদির রাহমান আল মিশরী ;

৩১. আল হাফিজ আবু উয়ানাহ আর ওয়াদ্দাহ ইবনে আবদিল্লাহ আল ইয়াসকুরী আল ওয়াসাতি আল বাজ্জাজ ;

৩২. আল কাদি শারীক ইবনে আবদিল্লাহি, আবু আবদিল্লাহ আল নাকাই আল কুফী ;

৩৩. আল হাফিজ আবদুল্লাহ (বা উবায়দুল্লাহ) ইবনে উবায়দুর রাহমান (বা আবদুল রাহমান) আল কুফী, আবু আবদুর রাহমান আল আশজাঈ ;

৩৪. নূহ ইবনে কায়েস, আবু রাওয়াহ আল হুদ্দানি আল বসরি ;

৩৫. আল মুত্তালিব ইবনে জিয়াদি ইবনে আবি জাহারিহ আল কুফী, আবু তালিব ;

৩৬. আল কাদি হাসান ইবনে ইব্রাহিম আল আনাজি, আবু হাশিম ;

৩৭. আল হাফিজ জারির ইবনে আবদিল হামিদ, আবু আবদিল্লাহ আদ দাব্বী আল কুফী আর রাজী ;

৩৮. আল ফাদাল ইবনে মুসা, আবু আবদিল্লাহ আল মারওয়াজি আল সিনানি;

৩৯. আল হাফিজ মাহমুদ ইবনে জাফর আল মাদানী আল বসরী ;

৪০. আল হাফিজ ইসমাইল ইবনে উলিল্লাহ আবু বিশর ইবনে ইব্রাহিম আল আসাদি ;

৪১. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম, আবু আমর ইবন আবি আদিয়া আস সুলামী আল বাগরী ;

৪২. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে খাজিম, আবু মু'আওয়িআ আত তামিম আদ ধার ;

৪৩. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ফুদায়িল, আবু আবদির রাহমান আর কুফী ;

৪৪. আল হাফিজ আল ওয়াকি ইবনে আল জাররাহ আর রুআসি আল কুফী ;

৪৫. আল হাফিজ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্, আবু মুহাম্মদ আল হিলালী আল কুফী;

৪৬. আল হাফিজ আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ির, আবু হিশাম আল হামাদানি আল খারিকি;

৪৭. আল হাফিজ হানাস ইবনে আল হারিছ ইবনে লাকিত আন-নখই আল কুফী;

৪৮. আবু মুহাম্মদ মুসা ইবনে ইয়াকুব আজ জামাই আল মাদানী;

৪৯. আল আলা ইবনে সালিম আল আত্তার আল কুফী;

৫০. আল আজরাক ইবনে আলী ইবনে মুসলিম আল হানাফী, আবুল যাম আল কুফী;

৫১. হানি ইবনে আয়ূব আল হানাফি আল কুফী;

৫২. ফুদাইল ইবনে মারজুক আল আঘার আর রুআসি আল কুফী ;

৫৩. আবু হামজা সা'দ ইবনে ওবায়দাহ আস সুলামি আল কুফী;

৫৪. মুসা ইবনে মুসলিম আর হিজামী আশ-শায়িবানী, আবু ইসা আল কুফী আত-তাহান (মুসা আস সাগীর);

৫৫. ইয়াকুব ইবনে জাফর ইবনে আবি কাসির আল আনসারী আল মাদানী ;

৫৬. ওসমান ইবনে সাদ ইবনে মুররাহ আল-কুরাইশি আবু আবদিল্লাহ (আবু আলী) আল কুফী।-(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩-৮১)।

এমনি ভাবে এই হাদীসখানা প্রতিটি যুগে প্রতিটি দিক ও বিভাগের অসংখ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনাক্রমিক ধারাবাহিকতায় আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের সকল শর্তপূরণে সত্যায়িত হয়ে এসেছে। সমকালীন যুগ জিজ্ঞাসার সন্ধিক্ষণে যারা এই হাদীসখানা তাদের স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- আল-আল্লামা আল আমিনি চৌদ্দশ শতকের বর্ণনাকারীর ক্রমানুসারে তাদের একটা তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর তালিকা মতে যাদের সংখ্যা দাড়ায়-৩৬০ জনে এসে কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় পরবর্তীদের নাম লিখিলাম না। -(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩-১৫১)।

কেউ কেউ এই হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেককে সন্দেহের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছেন। ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্রই জানেন যে, যদি কোন হাদীস বিশুদ্ধ হয়, তাহলে পৃথক পৃথক লোকের দেয়া বর্ণনায় আছে কি না তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও এই সন্দেহটাও যে অমূলক সে কারণে কিছু বিখ্যাত আসমাউর রিজাল বিশারদগণের মতামত আমি এখানে তুলে ধরলাম।

গাদীরের হাদীস ঃ মুহাদ্দিসগণের পর্যালোচনা

ক. আল হাফিজ আবু ঈসা আত-তিরমিযী (ইন্তেকাল ২৭৯ হিজরী) তার সহীহতে (সহীহ সিহা সিত্তাহ এর মধ্যে একটি), বলেন যে, "এটা একটা উত্তম সহীহ (হাসান সাহীহ) হাদীস"-আত তিরমিযী ঃ আস সহীহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ২৯৮)।

খ. আল হাফিজ আবু জাফর আত-তাহাবী (ইন্তেকাল ৩২১ হিজরী) তার মুশকিলুল আসান গ্রন্থে বলেন যে, "এই হাদীস বর্ণনাকারীর (ইসনাদ) ক্রমানুসারে সহীহ এবং এর বর্ণনাকারীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি" -আত তাহাবী ঃ মুশকিলুল আসার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৮)।

গ. আবু আবদুল্লাহ আল হাকীম আল নিশাপুরী (ইন্তেকাল ৪০৫ হিজরী) তার আল মুস্তাদরাক গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, "এই হাদীস সহীহ" -আল হাকীম আল মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ১০৯-১১০)।

ঘ. আবু মুহাম্মদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল আছেমি বলেন যে, "উম্মাহ এই হাদীস গ্রহণ করেছে যার মূলনীতির দিক দিয়েও বেশ দৃঢ়তা রয়েছে" [আল্লামা আমিনি ঃ আল গাদীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ২৯৫]।

ঙ. ফকীহ আবুল হাসান ইবনে আল-মাগাজেলী আল-শাফেয়ী (ইন্তেকাল ৪৮৩ হিজরী) এই হাদীসটিকে সহীহ সনদে আবুল কাশেম ইবনে ইছবাহানী থেকে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ রিজাল বিশারদদের মতো আরো কয়েকশ' জন বলেন যে, "এই হাদীস সহীহ"। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, উপরোক্ত মনীষীরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরম শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ পণ্ডিত মনীষীবৃন্দ।

সুন্নী আদর্শে একটি হাদীসকে তখনি 'সহীহ' বলা হয় যখন এটা নির্বিঘ্নে সেই সব লোকদের দ্বারা বর্ণিত হয় যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাদের স্মৃতি শক্তি নিখুঁত, প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন এবং তারা অস্বাভাবিক আচরণের (ভ্রান্ত) নন (সুবীহ আস সালিহ ঃ উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহাতুহ্, পৃষ্ঠা-১৪৫)।

যদি কোন হাদীস এর ইসনাদে, উপরোক্ত সকল গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় কিন্তু তার কোন এক বা একাধিক বর্ণনাকারী প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন না হন সহীহ হওয়ার চেয়ে কম যোগ্য হন, তখন তাকে বলা হয় হাসান (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৬-৬০)।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মনীষীবৃন্দ যখন বলেন, গাদীরে খুমের হাদীস সহীহ তখন তারা এটাই বোঝাতে চান যে, এর বর্ণনাকারী সৎ (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস বা কাজকর্মে গড়মিল নেই)। তাদের স্মৃতি শক্তি প্রখর এবং হাদীসেও কোনো ত্রুটি নেই বা অস্বাভাবিকতাও নেই।

গাদীরে খুমে সংঘটিত ঘটনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) তাঁহার অন্তিম মুহুর্তেও স্থলাভিষিক্ত তথা খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেন। আল্লামা হামদানী ও মোল্লা আলী হামদানী বর্ণনা করেন যে, যখন নবীপাক (সাঃ)-এর অন্তিমকাল নিকটবর্তী এবং হযরতের পবিত্র মস্তক মোবারক হযরত আলী (আঃ)-এর কোলে তখন তিনি ফরমাইয়াছেন, "ওহে আলী! তুমি আমার স্নেহের ভাই, ওয়াছি, উজির ও খলিফা" (মোআদ্দাত আল-কোরবা, পৃঃ-২৪)।

উলামা ও বিদগ্ধ মনীষিদের বর্ণনা হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে তাঁহার প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করার বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার বাসনায় অন্তিম কালে রোগ শয্যায় দোয়াত-কলম, কাগজ আনিতে আদেশ করেন যাহাতে ভবিষ্যতে খেলাফত সম্বন্ধে কোন প্রকার

বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই, তাঁহাকে জ্ঞান বিচ্যুত অর্থাৎ প্রলাপ বকিতেছেন বলিয়া আখ্যায়িত করে বাঁধা সৃষ্টি করিয়া শেষ বাসনা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। যাহার স্মৃতিচারণ করিয়া ইব্‌নে আব্বাস আজীবন কাঁদিতে থাকেন (সহীহ আল-বোখারী, খন্ড-২, পৃঃ ১১৮, আহমদ ইবনে হাম্বালের মুসনাদে আহমাদ, খন্ড-১, পৃঃ-২২২, নাদীর শরহে সহীহ মুসলিম, কেরমানীর শরহে বোখারী ইত্যাদি দ্রঃ)।

৯ম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে এরশাদ করেন, "হে আলী! আমার সহিত তোমার সেরূপ সম্পর্ক যেরূপ হযরত মুসা (আঃ)-এর সহিত হযরত হারুন (আঃ)-এর সম্পর্ক ছিল- অর্থাৎ হযরত হারুন (আঃ) যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর খলিফা ছিলেন তদ্রূপ তুমিও আমার খলিফা, ব্যতিক্রম শুধু এই যে হযরত হারুন (আঃ) নবীও ছিলেন, কিন্তু আমার পরে আর কেহ নবী হইবে না" (সহীহ মুসলিম, খন্ড-২, পৃঃ-২৭২, ১৩১৯ হিজরীতে দিল্লিতে মুদ্রিত, সহীহ বোখারী, খন্ড-৩, পৃঃ ৫৪, তাবারী, খন্ড-৪, পৃঃ ১৪৪, সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, খন্ড-২, পৃঃ ৩১৭, আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ১৬৭, ১৬৮, রিয়াজুন নাজরা, খন্ড-১৪, পৃঃ ১৬২)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে (একই নূরের দুইটি অংশ) এবং দেখ, আমার পরে সে-ই তোমাদের প্রকৃত ইমাম হইবে" (খাসায়েসে নাসায়ী, পৃঃ ৭৬ ও সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ২৫)।

এই সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কয়েকটি হাদীস ও মনিষীদের পর্যালোচনা ঃ

হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেন, "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা এবং আমি বিজ্ঞানের শহর আলী সেই শহরের দরজা।

শহরে প্রবেশ করিতে হইলে দরজা দিয়া আসিতে হইবে অর্থাৎ আমার নিকট পৌঁছিতে হইলে আলী-এর অনুসরণ করিতে হইবে– আলী জ্ঞানের ভান্ডার" (আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ুতি তাঁর জামে সগির, পৃঃ ১০৭ ও আহমাদ বিন মোহাম্মদ বিন সিদ্দিক মাগরাবীর 'ফাতাহুল মুলকুল্ আলী' যাহা মিসরের আল আজহারের ইসলামিয়া ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ও ১৩৫৪ হিজরীতে প্রকাশিত এবং যাহাতে উক্ত হাদীস সম্বন্ধেই কেবল বিস্তারিতভাবে লিখিত)।

হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেন যে, হযরত আলী (আঃ)-এর মহব্বত ও অনুসরণ ব্যতীত কেহই জান্নাতে যেতে পারবে না। পুলসেরাত অতিক্রম করতে হলে হযরত আলী (আঃ)-এর অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হবে (ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১১৬)।

রাসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেন যে, তোমরা যদি হযরত আলী (আঃ)-কে তোমাদের (নেতা) খলিফা মানিয়া চল তবে তিনি তোমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' পথে চালাবেন, কিন্তু আমি জানি তোমরা উহা মানিবে না (মেশকাত, পৃঃ ৫৫৯)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম, তিনি আসহাবে রাসূল আনাছ বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ৯ম হিজরীতে যখন সূরায়ে বারাতের'(সূরা তাওবা) ১০টি আয়াত নাজিল হয় তখন হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর-কে মক্কায় গিয়ে হজ্জের সময় হজ্জ সমাবেশে উহা প্রচার করিতে আদেশ করেন। অতঃপর হযরত আবু বকর নবী (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক রওয়ানা হইয়া মাকামে "জুল হুলায়ফায়" পৌঁছিলে পর নবী (সাঃ) হযরত জিব্রাইল আমিন কর্তৃক আদিষ্ট হন যে, যেহেতু ইহা ইসলাম প্রচারের অংশ বিশেষ এবং রেসালতের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত সে জন্যে হয় আপনি স্বয়ং উহা সমাধা করুন বা সেই ব্যক্তি ইহা

করিতে পারে যে আপনার স্থলাভিষিক্ত, আপনার ঘনিষ্ঠ ও ওয়াছি। তখন নবী (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে আদেশ করেন, "যত শীঘ্র সম্ভব তুমি রওয়ানা হয়ে আবু বকর হতে উক্ত আয়াতগুলো নিয়ে নিজে উহা মক্কাবাসীদের সমীপে প্রচার করিবে এবং আবু বকরকে ফেরত পাঠাইয়া দিবে, কারণ আমাকে খোদার এরূপ আদেশই হইয়াছে।" হযরত আলী (আঃ) মাকামে জুহফায় হযরত আবু বকরকে হযরতের নির্দেশ জ্ঞাপন করিয়া ঐ আয়াতগুলো তাহার নিকট হইতে হস্তগত করিয়া মক্কায় যথারীতি প্রচার করেন এবং হযরত আবু বকর নবী (দঃ) নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ফেরত ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবী (সাঃ) বলেন, "আমাকে খোদার ঐরূপ আদেশই হইয়াছে যে, হয় আমি স্বয়ং উহা সমাধা করি বা সেই ব্যক্তি ইহা করিতে পারে যে রেসালাতের কর্তব্য সমাধায় আমার সংঙ্গে অংশীদার। আলী আমা হতে, আমার গুণে গুণান্বিত, আমার ভাই, আমার উত্তরাধিকারী ও ওয়াছি, আমার আহলে বায়েতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, উম্মাতের জন্য আমার খলিফা, আমার কর্তব্যের সহায়ক, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত কার্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত নহে" (তাবাকাতে ইব্‌নে সাদ, তাবারীর রিয়াজুন নাজরা, আলী মোত্তাকির 'কানজুল উম্মাল', ইব্‌নে আছিরের তারিখ আল-কামেল, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র কোররাতা আয়নায়ন, তারিখে ইব্‌নে খালদুন, শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবীর 'মাদারেজুন নবুওয়াত', সহীহ তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩, মেশকাত, নাসায়ী ও ইমাম আহমদের মুসনাদ, খন্ড-১, পৃঃ ১৫১)।

হযরত নবী করীম (সাঃ) শেষ হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে জনমন্ডলীর সামনে ভাষণে (খোতবায়) ফরমাইয়াছেন যে, "আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে এবং রেসালাতের কর্তব্য হয় আমি সমাধা করিব অথবা আলী করিবে।"-(সুনানে ইব্‌নে মাজাহ, খন্ড-১, পৃঃ ৯২, কানজুল উম্মাল, খন্ড-৬, পৃঃ ১৫৩, ইমাম আহমদের মুসনাদ, খন্ড-৪, পৃঃ১৬৪)

মদীনায় হিজরত করার পর এবং মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সাহাবী নিজেদের বাসস্থান মসজিদের সংলগ্ন চারিপাশে নির্মাণ করেন কিন্তু সকলের মসজিদে প্রবেশ করিবার দরজা ও জানালা ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ করার জন্য খোদার আদেশ হয় কেবল স্বয়ং হযরত নবী (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য দরজা খোলা থাকে, হযরত আলী (আঃ)-এর খোদার নিকট কত মর্যাদা! একবার সা'দ বিন মালেক এমন এক সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেন যাহাতে হযরত আলী (আঃ)-এর কতকগুলি বিশেষ গুণাবলীর সম্পর্কে আলোচনা ছিল এবং উহা তিনি বর্ণনাও করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদ হইতে যখন সকলের দরজাদি বন্ধ করিবার আদেশ দেন তন্মধ্যে তাঁহার চাচা হযরত আব্বাসকেও ঐরূপ আদেশ দেন যাহাতে হযরত আব্বাস বলেন যে, আমাকেও আপনি সকলের সহিত দরজা বন্ধ করিবার আদেশ করিলেন কিন্তু হযরত আলী (আঃ)-কে সেরূপ কোন আদেশ করলেন না; তখন হযরত বললেন যে, আমি নিজে কাহাকেও বন্ধ করতে বা আলীকে রাখিতে আদেশ করি নাই। বরং আল্লাহ তা'য়ালাই এরূপ আদেশ দিয়াছেন' (মুসতাদরাক, খন্ড-৩, পৃঃ ১১৭)।

নবীপাক (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর আনসার ও মোহাজের সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং হযরত আলী (আঃ)-এর হাত ধরে বলেন যে, "হে আলী তুমি ইহকাল ও পরকালে আমার ভাই এবং আমাদের এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট ও চিরস্থায়ী" (তারিখে ইব্‌নে হিশাম ও ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৫৭)।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত আলী (আঃ) মহানবীর কাঁধে উঠে কা'বা ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং যে মোহরে নবুওয়াত চুম্বনে লোকের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়, সেই 'মোহরে নবুওয়াতের' উপরেই হযরত আলী

(আঃ)-এর পদযুগল রাখিলেন বা নবী তাহাই শোভনীয় মনে করলেন। (তারিখে খামিছ ও তারিখে রাওজাতুস সাফা দ্রঃ)। নবীপাক (সাঃ)-এর সহিত অগণিত মুসলমান ও প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ থাকা সত্বেও হযরত (সাঃ) কেবল হযরত আলী (আঃ)-এর সহায়তায় কুফরিয়ত ধ্বংস করিতেছিলেন ইহার কারণ বোধ হয় ইহাই হইবে যে, আলী (আঃ) কোন দিনও ঐ মূর্তিগুলির পূজা করেন নাই এবং প্রকৃত মুসলমান আর অন্যেরা এককালে মূর্তিপূজক থাকায় এবং পরে মুসলমান হওয়ায় তাহাদের মনে ঐ মূর্তিগুলি নষ্ট করিতে দ্বিধা থাকিতে পারে।

বনি নাজরানের খৃষ্টানদের সহিত হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মোবাহেলায় (পারস্পারিক অভিসম্পাত) খোদার নির্দেশ যাহা কোরআন পাকের সূরায়ে আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াতে (৩য় পারায়) বর্ণিত, স্বয়ং নবীপাক (সাঃ), হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে গমন করেন। ফলে খৃষ্টানগণ ঐ পাক-পাঞ্জাতনের চেহারা দেখে ভয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। তখন ঐ চার ব্যক্তিকে এতবড় একটি তর্কের (মোবাহেলার) মোকাবিলায় লইয়া যাইবার কারণ কি? আবার তাঁহাদের মধ্যে দুইজন শিশু এবং একজন নারী, ইহাও খোদার রহস্য বলিয়া মনে হয়। খোদা ইহাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও দ্বীনের তবলীগের বা কৃতকর্মে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি বা উপযুক্ত মনে করেন নাই। উক্ত আয়াতের অনূকুলে হযরত আলী (আঃ) নবীপাকের 'নাফসে গণ্য' হাসনায়েন ভ্রাতৃদ্বয় হযরতের পুত্রাদি বলিয়া গণ্য। (তফসিরে জালালাইন ও তাফসিরে বায়জাবী, খন্ড-১, পৃঃ ১১৮, মিসরে মুদ্রিত)

১১তম হিজরীর সফর চাঁদের ২৬ তারিখ নবীপাক ইনতিকালের দুই (২) দিন পূর্বে রোগ শয্যায় থাকিয়া উসামা বিন জায়েদ বিন হারেসাকে (যিনি মাত্র

১৭ বছর বয়স্ক এবং হযরতের প্রতিপালিত) ডাকিয়া সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে হযরত আলী ব্যতীত মদীনার গণ্যমান্য বিশিষ্ট সাহাবাদেরকে দিয়ে শামদেশের উবনা রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া রওয়ানা হইতে বলেন। রাসূলে কারীম (সাঃ) তাঁহার হস্তে পতাকা দিয়ে বলেন যে, দ্রুত সেখানে পৌঁছিয়া তোমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবে। উসামা পতাকা লইয়া অন্যান্য লোকদের সহ বাহির হইয়া বুরাইদাকে পতাকা দিয়া মদীনার বাহিরে শী'আ অবস্থান করেন কিন্তু সঙ্গীদের অনিচ্ছা ও আলস্যের জন্যে রওয়ানা হইতে পারেন নাই, হযরত বার বার তাকিদ করা সত্ত্বেও তাহাদের অবহেলার জন্যে তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হন" (তারিখে তাবারী, সীরাতে হালাবিয়া)।

অনেকেরই অভিমত যে, রাসূল (সাঃ) নিজের ওফাত সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর পর খেলাফত সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় সকলকে মদীনা হইতে বাহিরে পাঠাইবার জন্যে উপরোক্ত ব্যবস্থা করেন, কারণ তিনি ঐ বিশৃঙ্খলার আভাস পূর্বেই কিছুটা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, হযরত আলী (আঃ) যেন নির্বিঘ্নে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলিফা হইতে পারেন এবং উসামার সঙ্গীগণও বোধ হয় এ উদ্দেশ্যেই মদীনা ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। এ জন্যেই তাঁহারা নবীপাক (সাঃ)-এর পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন।

ইসলামের প্রত্যেক যুদ্ধেই হযরত আলী (আঃ) প্রধান সেনাপতি ও পতাকা বাহক থাকেন। তিনি কখনও কাহারও অধীনে থাকিয়া কোন যুদ্ধ করেন নাই। ইসলামের প্রত্যেক যুদ্ধই তাঁহার বীরত্বেই জয়লাভ হয়। কোন যুদ্ধেই তিনি রাসূল (সাঃ)-কে একা রাখিয়া পলায়ন করেন নাই; যেমন অন্যান্য সাহাবীগণ পলায়ন করিয়া ছিলেন। "আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধে শত্রু

পক্ষের বীর যোদ্ধা আমর বিন আব্দে ওয়াদের (খন্দক) পরিখা পার হইয়া হুঙ্কার ছাড়িলে সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর না হইলে রাসূল (সাঃ) মহাবীর আলী (আঃ)-কে তাহার মোকাবিলায় পাঠান এবং হযরত আলী (আঃ)-এর প্রশংসায় বলেন যে, 'পূর্ণ ঈমান পূর্ণ কুফরিয়াতের' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতেছে, সে খোদা ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে এবং পক্ষান্তরে খোদা এবং তাঁহার রাসূলও তাঁহাকে মহব্বত করেন– "হে খোদা! তুমি আলী-এর সহায় থাকিও।" হযরত আলী (আঃ) অতি বিক্রমে তাহাকে হত্যা করিলে রাসূল (সাঃ) আনন্দে পুলকিত হইয়া বলেন যে, "আলী -এর শাণিত তলোয়ারের আজিকার একটি আঘাত সমস্ত জিন্ন ও মানবকুলের কেয়ামত অবধি ইবাদতের তুলনায় শ্রেয়" (রাওজাতোস সাফা, মুসতাদরাক, খণ্ড ঃ ৩, পৃঃ ৩২)।

সাহাল বিন সাদ হইতে বর্ণিত যে, ইহুদীদের খায়বারের প্রসিদ্ধ কামুছ দূর্গ মুসলমানদের দ্বারা ঊনচল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ থাকিবার পরও অধিকার করিতে না পারায় এবং হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবীগণ সৈন্য সামন্ত লইয়া ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করিয়াও বিফল কাম হইল। রাসূল (সাঃ) ফরমাইলেন যে, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ পতাকা দিব যার হস্তে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়ই জয় করাইবেন, সে খোদা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)-কে মহব্বত করে এবং খোদা ও রাসূলও তাঁহাকে মহব্বত করেন। সে কখনও পলায়ন করিবে না ও বিফল হইবে না।

পরের দিন যদিও সকলেই পতাকা লাভের প্রত্যাশী ছিল কিন্তু রাসূল (সাঃ) অসুস্থ আলী (আঃ)-কে ডাকিয়া পতাকা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আক্রমণ করিবার আদেশ দেন। হযরত আলী (আঃ) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ইহুদীদের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মারহাব ও হারেস প্রমুখ অনেককে হত্যা করিয়া দূর্গ অধিকার করেন।" -(সহীহ বোখারীর ৮৯৯ হাদীস ও সহীহ মুসলিম দ্রঃ)

হযরত আলী (আঃ)-এর ইসলামের খেদমত ও ফাজায়েল বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বটে কারণ রাসূল (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, *"যদি দুনিয়ার সমস্ত সাগর কালি হইয়া যায়, সমস্ত বৃক্ষরাজি কলম হইয়া যায় এবং জ্বীন ও ইনসান মিলিয়া লিখিতে ও গণনা করিতে প্রবৃত্ত হয় তবুও হযরত আলী (আঃ)-এর ফাজায়েল লিপিবদ্ধ বা গণনা করা তাহাদের জন্যে দুঃসাধ্য হইবে।"*

হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত যে, কোরআন পাকে প্রায় ৩০০ আয়াত কেবল হযরত আলী (আঃ)-এর সম্বন্ধেই বর্ণিত এবং অন্য কাহারো সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত হয়নি।

হযরত আলী (আঃ) নিজেও বলিয়াছেন যে, কোরআন চার অংশে বিভক্ত, এক চতুর্থাংশ কেবল তাঁহার ও আহলে বায়েতদের সম্বন্ধে বর্ণিত, এক চতুর্থাংশ তাঁহার ও নবীপাকের শত্রুদের কুৎসায়, এক চতুর্থাংশ পূর্বেকার নবীদের সময়ের ঘটনাবলীতে এবং এক চতুর্থাংশ কেবল শরীয়তের নির্দেশাবলী সম্পর্কে বর্ণিত। (দ্র. নাহজুল বালাগা)

গবেষক-বিশ্লেষক-ঐতিহাসিক-মনীষিদের দৃষ্টিতে

আল-গাদীর

১৮ই যিলহজ্ব তারিখে বিদায় হজ্বের পরে গাদিরে খুমে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর উপরে প্রত্যেক দিক ও বিভাগের মুসলিম-অমুসলিম জ্ঞানী ও গুণী বুদ্ধিজীবি পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ যে আলোচনা-পর্যালোচনার অবতারণা করেছেন এই অধ্যায়ে আমরা সেই সকল পর্যালোচনা সম্পর্কে আলোকপাত করব যে, তাঁরা কে, কিভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব যাতে পাঠক মহল এই মহা বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, একটি অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন। কেননা হযরত আলী (আঃ)-এর অবস্থান-মর্যাদা, নবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের দুই প্রধান সম্প্রদায়– শী'আ তথা আলীর অনুসরণকারী এবং সুন্নী তথা- নবীর সুন্নাহ্‌র অনুসারী দাবীদারদের মধ্যে মতান্তর ব্যাপক, তাই ঐতিহাসিক, হাদীস বিশারদ, মুফাসসির এবং সত্য সন্ধানী গবেষকগণ মতান্তরের বিষয়গুলোকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাও খতিয়ে দেখা জরুরী। সম্মানিত পাঠক! এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য রাখার জন্য বলছি– গবেষকদের নিজস্ব মতামতের হুবহু উদ্ধৃতি হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় আমরা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব-এর নামের শেষে (আঃ) বা (রাঃ) প্রভৃতি উল্লেখ করিনি; এতে বিষয়ের গুরুত্বই বরং ঠিক থাকে। আর দু' একটি ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন মনে করে তারকা চিহ্ন দিয়ে নিচে তার ব্যাখ্যা/টিকা পেশ করেছি। আশা করি বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

নিম্নে আমরা লেবাননের একজন অধ্যাপক, গবেষক-লেখকের লব্ধ কিছু বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার উল্লেখ করছি।

তিনি হযরত আলী (আঃ)-এর মর্যাদার নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর আলোচনা শেষে ক্রমধারামূলক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরেন এভাবে ঃ

এক. নবুয়্যতের প্রথম পর্যায়ে যখন 'তোমার নিকটাত্মীয় ও স্বগোত্রীয়দের সতর্ক কর' (২৬ ঃ ২১৪) এই আয়াত অবতীর্ণ হল (প্রথম ওহী নাযিলের প্রায় তিন বছর এবং খাদিজা, আলী ও আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের পর), নবীজি বনু আবদুল মুত্তালিবের সবাইকে একত্রিত করে তাঁর পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। এ মহান মিশন বুঝিয়ে বলার পর তিনি এ লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য উপস্থিত সকলের সমর্থন ও সহযোগিতার আহবান জানালেন। সাহায্যের বদলে নবীজি লাভ করলেন শুধু উপহাস। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আলী, যিনি মাত্র তের বছর বয়স্ক হয়েও নবীজির প্রতি উদ্দীপ্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। (দ্র. মাসূদী, মুরুজ, ২, পৃ. ২৭৭, তাবারীর বর্ণনা ও দেখুন, ইবনে কাসির ও সালাবী ২৬ নং সূরার ২৯৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

দুই. মুহাম্মদ ও আলীর মধ্যকার ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অগ্রাধিকার যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে, এ সমস্ত ঘটনাক্রমে তা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। হিজরতের আগে একবার এবং পরে আবার মদীনাতে নবীজি আলীকে তাঁর ধর্মের ভাই (ইখ্ওয়া) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এটা এমনই এক ঐতিহাসিক সত্য ছিল যে কোন ঐতিহাসিকই এটা অস্বীকার করেননি।

তিন. সাহাবাদের চোখে আলীর বিশেষ মর্যাদার আসন তখনই ধরা পড়েছিল, যখন তাঁকে বদর, খাইবার এবং অন্যান্য যুদ্ধে ঝান্ডাবাহী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। (ইবনে হিশাম, ২, ২৬৪ পৃ., ৩, ৩৪৯ পৃ., ইস্তিয়াব, ৩, পৃ. ১০৯৭, ইকদ, ৪, পৃ. ৩১২)

চার. তাবুকের যুদ্ধের সময় মদীনার দায়িত্বে আলীর নিয়োগ ছিল আলীর বিশেষ মর্যাদার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন (ইবনে হিশাম, ৪, পৃ. ১৬৩) এ সময়েই ঐ বিখ্যাত হাদীসটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যাতে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন 'হারুন যে রকম ছিল মূসার সাথে তুমিও আমার সাথে ঠিক সে রকম, তফাৎ শুধু এই যে আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। (ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত সহীহ বুখারী, ২, পৃ. ১৯৪,নওবখতি, ফিরাক, পৃ. ১৯ ইকদ, ৪; পৃ. ৩১১, ইসতিয়াব, ৩, পৃ. ১০৯৯)। তাবুকের ঘটনার সাথে জড়িত এ হাদীসটি প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক ও হাদীস সংগ্রহকারীদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর যেখানে আমরা দেখি যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যক্তিত্ব ও কর্মসূচীর সাথে পূর্ববর্তী অন্যান্য মহান নবীদের মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে সেখানে এ হাদীসটি গ্রহণ করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের অনেকগুলো অনুচ্ছেদের মধ্যে একটিতে (২০, ২৯-৩২), মুসা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, 'আর আমাকে আমার পরিবারের মধ্য হতে আমার ভাই হারুনকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, তার মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করে দাও, আর আমার কাজে তাকে অংশীদার করে দাও।' তাই মুসার সাথে মুহাম্মদের তুলনা একজন হারুন ছাড়া অপূর্ণ থেকে যেত, আর নিঃসন্দেহে আলী ছাড়া তাঁর পরিবারের অন্য কেউ হারুনের ভূমিকা পালন করতে পারতেন না।'

পাঁচ. এ ছাড়াও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সূরা 'আল-বারাআ' (যার আরেক নাম সূরা 'তওবা') এর সংবাদ বহন। হিজরী নবম বর্ষে

নবীজি হজ্জ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে মক্কায় আবু বকরকে পাঠান। আবুবকর মক্কায় রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পর নাজেল হয় সূরা বারাআ', যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। যখন লোকেরা প্রশ্ন করলো হজ্জে আগত বিভিন্ন মুশরেকদের কাছে এ ঘোষণা রাসূলের পক্ষ থেকে শুনিয়ে দেবার জন্য মুসলমানদের হজ্জ প্রতিনিধি দলের নেতা আবু বকরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে কিনা তদুত্তরে নবী (সাঃ) জবাব দিলেন 'না , আমি আমার পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি (রাজুলুম মিন আহ্‌লি বাইতি) ছাড়া আর কাউকে পাঠাবো না।' নবীজি তারপর আলীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর নিজস্ব উট নিয়ে তৎক্ষণাৎ মক্কা গিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কুরআনের বাণী লোকদের পৌছে দেবার আদেশ প্রদান করেন। (ইবনে হিশাম, ৪, পৃ. ১৯০ (অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও হাদীসবেত্তা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত)

এই সমস্ত ঘটনার সত্যতা সন্দেহ করার তেমন জোরালো কোন ভিত্তি নেই, যেগুলো প্রায় সকল মতের লেখকদের দ্বারাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ গুলোকে যথাযথ বলে মেনে নেওয়ারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। এমন কি চরম সাবধানতা ও সন্দেহবাদের আশ্রয় নেওয়ার পরও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আলীর স্বপক্ষে এ সমস্ত ঘটনাবলী এতটা বেশী প্রচারিত হয়েছিল যে প্রাথমিক যুগ থেকেই ঐতিহাসিক ও হাদীস সংগ্রহকারীদের এগুলো লিপিবদ্ধ করতে হয়েছিল।

এ সমস্ত ঘটনাক্রমের মধ্যে বিখ্যাত অথচ বিতর্কিত* গাদিরে খুম

* বিতর্কিত কথাটি বহু মতান্তর/মতপার্থক্য অর্থে।

সম্পর্কিত হাদীস যার উপর শি'আরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তা ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাটির নাম দেয়া হয়েছে মক্কার অদূরে মক্কা-মদীনার পথে গাদীরে খুম নামে বৃক্ষশোভিত একটি জলাভূমির নামে যেখান থেকে লোকেরা বিভিন্ন গন্তব্যের দিকে ছড়িয়ে যেত। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর বিদায় হজ্জ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৮ ই যিলহজ্জ্ব তারিখে (১০ই মার্চ ৬৩২ খৃঃ) গাদীরে খুম যেখান থেকে মক্কা হতে আগত তাঁর সঙ্গী হাজীরা এ সংযোগস্থল হতে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাবার কথা, সেখানে একটা ঘোষণা দেয়ার জন্য থামলেন। নবীজির আদেশে একটা তাঁবুর জন্য গাছের ডাল দিয়ে বিশেষ মঞ্চ তৈরী করা হল। যোহরের নামাযের পর, ওফাৎ পূর্ববর্তী বৃহত্তম জনসমাগমে তিনি বক্তব্য রাখেন। আলীকে এক হাতে ধরে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর অনুসারীদের প্রশ্ন করলেন যে, তিনি [মুহাম্মদ (সাঃ)] কর্তৃত্বের দিক থেকে ও ব্যক্তি হিসেবে (আওলা) ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিনা? জনতা সমস্বরে চিৎকার করে বললো, "নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ।" তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি যে ব্যক্তির মাওলা [পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, নেতা, বন্ধু?] আলীও তার মাওলা (মান কুন্‌তু মাওলাহু ফা আলী-উন মাওলাহু)। হে খোদা, তুমি তার বন্ধু হও, যে আলীর বন্ধু, তার শত্রু হও যে তার শত্রু '(আল্লাহুম্মা ওয়ালী মান ওয়ালাহু ওয়া আদি মান আদাহু)"।

এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে এমন কি অত্যন্ত গোঁড়া সুন্নী লেখকরাও খুব কমই প্রশ্ন তুলেছেন বা অস্বীকার করেছেন। যাঁরা নিজেরাই এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বল তাঁর মুস্‌নাদ গ্রন্থে, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে

মাযা, আবু দাউদ এবং অন্যান্য প্রায় সমস্ত 'সুনান' লেখক, ইবনে আল-আমীর তাঁর উস্‌দ আল-ঘাবা গ্রন্থে, ইবনে আবদুল বার তাঁর ইস্‌তিআব গ্রন্থে, যাঁরা অনুসৃত হয়েছিলেন অন্যান্য জীবনীকার কর্তৃক এবং এমন কি আবদুর রাব্বিহ্‌ তাঁর ইক্‌দ আল-ফরিদ এবং জাহিজ তাঁর উস্‌মানিয়া গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন (ভেকসিয়া বেগ লিয়ারী, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নূতন সংস্করণ লাইডেন; হল্যান্ড; ১৯৬০ কার্য বিবরণী-এর প্রবন্ধ "গাদীর খুম" সেখানে ইকদ ৪ পৃ. ৩১১ ছাড়া অবশিষ্ট সকল উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের সঠিক উল্লেখ রয়েছে)। গাদিরে খুমের হাদীসটি এত বেশী স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে আর বিভিন্ন মতের এত বেশী সূত্র হতে সত্যায়িত হয়েছে যে এর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। ইব্‌নে কাসীর (আল বিদাঁয়া ওয়ান নিহায়া- কায়রো, ১৩৪৮-৫১ হিজরী, পৃ. ২০৮-১৪), যিনি সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গির একজন গোঁড়া সমর্থক, তিনি এ বিষয়ের উপর সাতটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন এবং বহু সংখ্যক ইস্‌নাদ সংগ্রহ করেছেন যা থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌নে কাসিরই আবার জানাচ্ছেন যে বিখ্যাত (ইয়াকুত এর 'ইরশাদ' গ্রন্থেও উল্লিখিত অধ্যায় ৬, পৃঃ ৪৫২ উল্লিখিত)-এ গাদিরে খুমে আলীর পক্ষে নবীজির ভাষণের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন একজন আধুনিক পন্ডিত হুসাইন আলী মাহ্‌ফুয। গাদীরে খুমের উপর তাঁর সূক্ষ্ম গবেষণায় দলিলসহ উল্লেখ করেছেন যে গাদীরে খুমের হাদীসটি কমপক্ষে ১১০ জন সাহাবা, ৮৪ জন তাবিঈন, ৩৫৫ জন উলামা, ২৫ জন ঐতিহাসিক, ২৭ জন হাদীস সংগ্রহকারী, ১১ জন ফিকাহ্‌বিদ, ১৮ জন ধর্মতাত্বিকও ৫ জন ভাষাতাত্বিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে (দেখুন ঃ তারীখ আশ-শী'আ কারবালা, এন, ডি, পৃ. ৭৭ অধুনা গাদীরে খুমের উপর অসংখ্য বই বেরিয়েছে, আমিনীর আল-গাদীর ৩৮ খন্ডে এবং আল-মুসাভীর তাবাকাত আল-আনওয়ার ৩৪ খন্ডে বেরিয়েছে; এসব হাদীসে রিযাল

সম্পর্কিত বিষয়ের উপর লিখা হয়েছে)। পরবর্তীকালে এদের অধিকাংশকেই সুন্নীরা নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

হোরোভিট্জ (দেখুন ঃ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নূতন সংস্করণ ১৯১৩-৩৮; লাইডেন; হল্যান্ড-এর প্রবন্ধ "কুমাইত") ও গোল্ডজিহার (দেখুন ঃ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নূতন সংস্করণ লাইডেন; হল্যান্ড ১৯৬০ কার্যবিবরণী-এর প্রবন্ধ "গাদীরে খুম"); গাদীরে খুমের উপর তাঁদের পরিচালিত গবেষণায় বলেন যে, এই হাদীসের প্রাচীনতম দলিল হচ্ছে কুমাইতের (ইন্তেকাল ১২৬/৭৪৩-৪) প্রাচীন কবিতা, যা তাঁরা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য বলে মনে করেন। এই দুই পন্ডিতের কুমাইতের পূর্ববর্তী কোন নথিকে গ্রহণ না করার পেছনে ঘটনাস্থলেই রচিত নবীজির কবি হাসান বিন সাবিতের কবিতাকে অসত্য বলে সন্দেহ করা। যাই হোক, কিছু সুন্নী সহ শী'আ সূত্রগুলোর দাবী অনুযায়ী প্রাচীনতম দলিলটি হচ্ছে হাসান বিন সাবিতের কবিতা যা তিনি নবীজির সম্মতি নিয়ে, যখন লোকেরা এ উপলক্ষে আলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন সাথে সাথে রচনা ও আবৃতি করেছিলেন (দেখুন ঃ আল্লামা আমিনীর "আল-গাদীর" ২ পৃ. ৩২, আমিলীর "আয়ান আশ-শি'আ" ৩, পৃ. ৫২৪-৩২)। এ সত্যটাকে সামনে রেখে যে, হিজরতের পর নবীজির প্রথম ঐতিহাসিক হজ্জ্বে নবীজির আনুষ্ঠানিক কবি– হাসান বিন সাবিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি নবীজির সবগুলো উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন, এটা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য যে ঘটনাটা তাঁর দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়নি।

ঘটনাটি রাসূলের (সাঃ) জীবনীর জন্য সাধারণভাবে পঠিত

কয়েকজন গ্রন্থকার যেমন ইব্‌নে হিশাম, তাবারী ও ইব্‌নে সা'দ কর্তৃক উল্লিখিত হয়নি। তাঁরা হয় গাদীরে খুমে মুহাম্মদের (সাঃ) যাত্রাবিরতির ঘটনা নীরবে এড়িয়ে যান কিম্বা উল্লেখ করলেও এ হাদীসটির কথা বলেন না। ভেক্‌সিয়া ভ্যালেরী এ কয়েকজন লেখকের মনোভঙ্গির বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে যে তাঁরা 'সুস্পষ্টভাবেই তার্কিক শী'আদের পক্ষে মশলা সরবরাহ করে ক্ষমতায় আসীন সুন্নীদের কোপানলে পড়তে চাননি। ফলে মুহাম্মদের পাশ্চাত্য জীবনীকার, যাঁদের গবেষণা এ সমস্ত সূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল তাঁরাও গাদীরে খুমের ঘটনা সম্পর্কে নির্বাক। তবে এটা নিশ্চিত যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এ স্থানে কথা বলেছিলেন এবং বিখ্যাত উক্তিটিও করেছিলেন। কেননা ইয়াকুবীর মত সুপরিচিত আলী সমর্থকই নয় বরং যে সমস্ত হাদীস সংগ্রহকারীকে গোঁড়া সুন্নী বলে ধারণা করা হয়, বিশেষতঃ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ, 'সে সবে এ ঘটনা সংক্ষেপে বা বিশদভাবে সংরক্ষিত হয়েছে; এবং এ হাদীস এত বেশী স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বিভিন্ন ইস্‌নাদের দ্বারা এত ভালভাবে সত্যায়িত হয়েছে যে এগুলোকে ফেলে দেয়া অসম্ভব মনে হয়' (দেখুন ঃ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নূতন সংস্করণ লাইডেন; হল্যান্ড; ১৯৬০ কার্যবিবরণী-এর প্রবন্ধ "গাদীরে খুম")।

সুন্নী ও শী'আদের মধ্যে মূল মতানৈক্যটা গাদীরে খুমের ঘটনার সত্যতা কিংবা আলীর পক্ষে নবীর উপরোল্লিখিত ঘোষণা নিয়ে নয় কিম্বা কখনোই তা ছিল না। আসল মতানৈক্যটা হচ্ছে মাওলা শব্দের অর্থ নিয়ে। শী'আরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ শব্দকে নেতা, কর্তা ও অভিভাবক এবং স্পষ্টতঃই নবীজির মনোনীত উত্তরাধিকারী অর্থে গ্রহণ

করেছে। অপর পক্ষে সুন্নীরা 'মাওলা' শব্দের ব্যাখ্যা করেছে একজন বন্ধু, বা নিকটাত্মীয় ও বিশ্বস্ত হিসেবে (ইবনে কাসির, গাদীর খুম)। সন্দেহ নেই যে এই আরবী শব্দের অর্থের প্রাচুর্য্য ও তার ফলে সৃষ্ট দ্ব্যর্থবোধকতা উভয় ব্যাখ্যাকেই সমান সঙ্গত বলে স্বীকৃতি দেয়। সুন্নীরা এ হাদীসটি গ্রহণ করার সময় বলে যে, রাসূল তাঁর অনুসারীদেরকে শুধু তাঁর চাচাতো ভাই ও একমাত্র জীবিত কন্যার জামাতাকে সম্মান ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখার কথা বুঝিয়েছেন মাত্র। উপরন্তু সুন্নীরা ব্যাখ্যা দেয় যে, আল-ইয়ামান অভিযান যা আলীর নেতৃত্বে ঠিক তখনি সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে তিনি অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নিয়ে সরাসরি মক্কায় হজ্বে অংশ নিয়েছিলেন, তাতে গনীমতের মাল বন্টনে আলীর নিরপেক্ষ ও কড়া ব্যবহারের দরুন কিছু কিছু লোকের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, আর এ পরিস্থিতিতেই রাসূলের এ উপদেশ দেয়াটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। তাঁর জামাতার প্রতি এ হেন বিরূপ মনোভাব দূর করার জন্যই রাসূল এভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন (দ্র. ইবনে কাসির ঐ)। এ ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়ার পরও আলীকে ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে নবীজির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পেশ করে এ ধরনের একটা অনন্য ঘোষণা শী'আ দাবীর স্বপক্ষে একটা শক্ত ভিত্ প্রস্তুত করেছে।

গাদীরের হাদীসের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন

বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ হলো অত্র গাদীরের হাদীস খানা মোতাওয়াতির না হলে একে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ?

তাঁরা আরো বলেন যে, স্বয়ং শি'আরা বিশ্বাস করে ইমামত প্রমাণের জন্য হাদীস মোতাওয়াতির হতে হবে কারণ তাদের মতে ইমামত উসূলে দ্বীন বা ধর্মের মৌল বিষয়ের অন্তর্গত। হাদীসটি যেহেতু আহ্‌লে সুন্নাহর নিকট মোতাওয়াতির নয় সুতরাং প্রমাণ হিসেবে এ হাদীসের উপস্থাপন গ্রহণযোগ্য নয় যদিও তার সনদ সহীহ হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আপত্তির জওয়াবের সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ

* প্রাকৃতিক নিয়মেই গাদীরের হাদীস মোতাওয়াতির।
* হাদীসটি বর্ণনার পশ্চাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহও বিদ্যমান।
* রাসূল (সাঃ) স্বয়ং এটি বর্ণনায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।
* আলী (আঃ)-ও তদ্রুপ হাদীসটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন।
* ইমাম হুসাইন (আঃ) এটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।
* ইমাম হুসাইনের বংশধারার নয়জন ইমামই এ হাদীসকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন।
* শি'আরা এ হাদীসকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে।
* এমন কি আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র সূত্রেও গাদীরের হাদীস মোতাওয়াতির।

জওয়াবের বিস্তারিত রূপ ঃ

১। স্বাভাবিকভাবেই গাদীরের হাদীস মোতাওয়াতির হতে বাধ্য। কারণ এমন পরিবেশে মহান আল্লাহ্ তা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন যে, অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনার মত সেখানেও হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল যাঁরা বিভিন্ন স্থান হতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন যাতে করে এ খবর তাঁদের মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে পৌছে যায় এবং এ ঘটনা ঐ বংশধারার ব্যক্তিদের বিশেষ দৃষ্টিতে ছিল বলেই তাঁদের বন্ধুদের মাধ্যমে তা সকল যুগে ও সকল স্থানে পৌছেছে। তাই এই হাদীসটি মোতাওয়াতির না

হয়ে পারে কি? না, কখনো নয়। তাই এটি জলে-স্থলে সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র সেই নিয়মে যাতে কোন পরিবর্তন নেই- ولن تجد لسنّة الله تحويلا (এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।)

২। গাদীরের হাদীস মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ দৃষ্টিতে ছিল বলেই তাঁর নবীর ওয়াহি হিসাবে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এর ঘোষণা দিয়েছেন যা মুসলমানরা দিবারাত্রি কখনো নিভৃতে, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নামায ও প্রার্থনায়, কখনো মিম্বারে, কখনো মসজিদে, কখনো উপাসনার স্থানে (জায়নামাযে) তেলাওয়াত করে। আয়াতটি হলো ঃ

يَاايها الرّسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ...

হে নবী! যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন তবে রেসালাতের কোন দায়িত্বই আপনি পালন করেন নি। আল্লাহ্ আপনাকে লোকদের হতে রক্ষা করবেন।[১] (সূরা মায়েদা ঃ ৬৭)

---

১. শি'আদের নিকট বিষয়টি নিশ্চিত যে, এ আয়াতটি গাদীরে খুমে আলী (আঃ)-এর বেলায়েত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হাদীসটি আহ্‌লে বাইতের ইমামদের হতে মোতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু আহ্‌লে বাইত ব্যতীত অন্য সূত্রে, যেমন ইমাম ওয়াহেদী তাঁর 'আসবাবুন নুযূল' গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদার এই আয়াতের তাফসীরে দু'টি নির্ভরযোগ্য সূত্রে আতীয়াহ্ ও আবু সাঈদ খুদরী হতে বলেছেন এই আয়াতটি গাদীরে খুমে আলী ইবনে আবি তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাফেজ আবু নাঈম তাঁর 'নুযূলুল কোরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে দু'টি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন যার একটি আবু সাঈদ খুদরী ও অন্যটি আবু রাফে হতে।

ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ হামুইয়ানি শাফেয়ী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে আবু হুরাইরা হতে কয়েকটি সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইসহাক সা'লাবী তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের অর্থে দু'টি নির্ভরযোগ্য সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। এ শানে নুযূলের পক্ষে দলিল হলো উপরোক্ত আয়াত নাযিল হবার পূর্বেই নামায কায়েম হয়েছিল, যাকাত ওয়াজিব হয়েছিল, রোযা ও হজ্জ ফরয বলে ঘোষিত হয়েছিল, এগুলোর বিধি-বিধানসমূহ ও সার্বিকভাবে সকল হারাম ও হালাল রাসূল (সাঃ) শরীয়ত প্রবক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি ব্যতীত কিছুই অবর্ণিত ছিল না যাতে করে মহান আল্লাহ এতটা তাগিদ ও গুরুত্ব দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দিবেন এবং প্রচার না করাকে ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করে ভীতি প্রদর্শন করবেন। তাই খেলাফত ব্যতীত এমন কোন বিষয় ছিল না যে বিষয়টিতে নবী (সাঃ) মানুষের মধ্যে ইখতিলাফ ও বিভেদের ভয় পাচ্ছিলেন যে কারণে তা প্রচারে দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং সেজন্যই আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও বলেছেন তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন।

অতঃপর যখন রাসূল (সাঃ) আলী (আঃ)-এর ইমামত ও খেলাফত ঘোষণার রেসালতী দায়িত্ব সম্পাদন করলেন তখন আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا

এই দিন তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[২]

তাই এটি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যে কেউ এ আয়াতটির বিষয়ে চিন্তা করবে সে আল্লাহ্র এ বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহের প্রতি অনুগত হবে।

৩। যখন দেখা যাচ্ছে বিয়টির প্রতি মহান আল্লাহ্র বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে তখন তাঁর নবীরও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক। এ জন্যই যখন তিনি তাঁর ওফাত নিকটবর্তী হবার আশঙ্কা অনুভব করেছেন তখনই আল্লাহ্র নির্দেশে বিদায় হজ্জের সময় সকলের সম্মুখে আলীর বেলায়েত ও নেতৃত্বের ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'ইয়াওমুদ্দার'-এ যেদিন প্রথমবারের মত নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন করেন সেদিন হতে আলীর নেতৃত্বের বিষয়ে একের পর এক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেগুলোকে যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং বিষয়টির গুরুত্ব চিন্তা করে হজ্বের মৌসুমের পূর্বেই ঘোষণা করেছেন এটি তাঁর শেষ হজ্ব। তাই ইসলামী সাম্রাজ্যের সকল স্থান হতে মুসলমানরা রাসূলের সঙ্গে

২। আহ্লে বাইতের ইমামদের হতে এ বিষয়ে সহীহ হাদীস সমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত যদিও বুখারী বলেছেন এ আয়াত আরাফাত দিবসে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঘরের মানুষ ঘরের বিষয়ে অপর হতে অধিকতর জ্ঞাত।

মদীনায় মিলিত হন এবং এক লক্ষ লোকসহ তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করেন[৩] ও তাদের সম্মুখে এ ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর আরাফাতে পৌঁছার পর রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করলেন,

علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني الا أنا و علي

"আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। আমার পক্ষ হতে আমি এবং আলী ব্যতীত কেউ কিছু ঘোষণা করতে পারবে না[৪]।"

যখন রাসূলুল্লাহ্‌র কাফেলা প্রত্যাবর্তন শুরু করে 'গাদীরে খুম' উপত্যকায় পৌঁছে তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। রাসূল (সাঃ) তা প্রচারের নির্দেশ পেয়ে যাত্রা বিরতি করেন এবং অগ্রবর্তীদের ফিরে আসার ও পশ্চাতবর্তীদের জন্য অপেক্ষার নির্দেশ দেন। যখন সকলেই সমবেত হলেন তখন তিনি ফরয নামায আদায় করলেন এবং আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে খুতবা পড়লেন যার কিছু অংশ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যা আপনার জন্য যথেষ্ট মনে করি।

ঐ দিন যাঁরাই নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁরা এ বাণী অন্যদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী ছিল ও বিভিন্ন স্থান হতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র নিয়মের স্বাভাবিক রীতিতেই হাদীসটি মোতাওয়াতির হয়েছে (যদিও তা বর্ণনার পথে অনেক বাধা ছিল)। এছাড়া আহ্‌লে বাইতের ইমামগণও এ হাদীসটি প্রচারের জন্য যে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন তা ঐ লক্ষ্যকেই অন্বেষণ করছিল।

৪। স্বয়ং আলী তাঁর খেলাফতের সময়কালে একদিন কুফার রাহ্‌বা নামক স্থানে বক্তব্যে বলেন, "আপনাদের প্রতি কসম দিয়ে বলছি যাঁরা গাদীরে খুমে

---

৩. আহমাদ যাইনী দাহলান তাঁর 'আস্‌সিরাতুন নাবাভীয়া' গ্রন্থে 'বিদায় হজ্ব' অধ্যায়ে বলেন, "নবী (সাঃ) মদীনা হতে নব্বই হাজার লোক, কোন কোন বর্ণনা মতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকসহ যাত্রা করেন।" তিনি বলেন, "এর বাইরেও অনেকেই মক্কায় বা আরাফায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।" তাই গাদীরের হাদীসের সাক্ষী এক লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি।

৪. বিস্তারিত দেখুন আল্লামা শারাফুদ্দীন মুসাভীর আল-মুরাজায়াত।

রাসূল (সাঃ) হতে আমার বিষয়ে শুনেছেন তাঁরা দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিন। কিন্তু যাঁরা নিজের চোখে রাসূলকে বলতে দেখেন নি বা কর্ণ দিয়ে শুনেন নি তাঁদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।" বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১২ জন সাহাবীসহ ৩০ জন সাহাবী দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, নবী (সাঃ) আলীর হাত ধরে বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা কি জান না আমি মুমিনদের ওপর তাদের হতে অধিকার রাখি?" সকলে বলল, "হ্যাঁ।" তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালবাসে তুমি তাকে ভালবাস আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর।"

আপনাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট যে ত্রিশ জন সাহাবীর পক্ষে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এরূপ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই তাঁদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঘটনাটি মোতাওয়াতির হয়ে যায় এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। সেদিন যে সকল ব্যক্তি রাহ্‌বায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও বিষয়টি শুনেছেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর তা অন্যদের নিকট প্রচার করেছেন।

রাহ্‌বা'র ঘটনাটি আলী (আঃ)-এর খেলাফতের সময় অর্থাৎ ৩৫ হিজরীর পর ঘটেছিল। এ ঘটনাটি হতেও বোঝা যায় আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা বিদায় হজ্বের পর গাদীরে খুমে ঘটেছিল এবং গাদীর ও রাহ্‌বা'র দিনের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিজয়, মহামারী ও অন্যান্য ঘটনায় গাদীরে উপস্থিত অনেক ব্যক্তিই মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং সেদিনের যুবক ও মুজাহিদদের অনেকেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তাঁর রাসূলের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতেন। তাই কেবল যাঁরা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর সঙ্গে ইরাকে বসবাস করতেন তাঁদের একটি অংশ সেদিন রাহ্‌বায় ছিলেন ও গাদীরের ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে বার জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (বদরী)

সাহাবী ছিলেন। অবশ্য গাদীরে উপস্থিত কিছু ব্যক্তি সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকলেও সাক্ষ্য দান করেন নি যেমন আনাস ইবনে মালিক।[৫]

যদি সেদিন আলীর পক্ষে জীবিত সাহাবীর (পুরুষ ও নারীসহ) রাহ্বায় একত্রিত করে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভব হত তবে তার সংখ্যা ঐ ত্রিশের কয়েক গুণ হত। আর যদি এর পঁচিশ বছরে পূর্বে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত তবে তাদের সংখ্যা কিরূপ হত একটু চিন্তা করুন। যদি এ সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন তবে গাদীরের হাদীস মোতাওয়াতির হবার সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হাতে পেয়েছেন।

রাহ্বা'র ঘটনা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় আবু তুফাইল হতে যাইদ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আলী রাহ্বায় সকলকে সমবেত করে বলেন ঃ আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, এখানে উপস্থিত সেই সকল মুসলমান যাঁরা গাদীরের দিবসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের আহ্বান করে বলছি তাঁরা দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) হতে যা শুনেছেন তা বলুন। ত্রিশ ব্যক্তি দাঁড়ালেন।" কিন্তু আবু নাঈম বলেছেন, "অনেকেই দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন রাসূল (সাঃ) আলীর হাত ধরে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তোমরা কি জানো আমি মুমিনদের ওপর তাদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন ঃ আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! তুমি আলীর বন্ধুকে ভালবাস ও তার শত্রুকে শত্রু গণ্য কর।"

---

৫. ইমাম আলী (আঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেন, "কেন তুমি রাসূলের অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে যা দেখেছ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে না?" তিনি বলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার বয়স অনেক হয়েছে তাই ভুলে গিয়েছি।" আলী বললেন, যদি মিথ্যা বলে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করুন যাতে তোমার পাগড়ীও তা আবৃত করতে না পারে।" তখনও তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করেন নি তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এরপর সব সময় বলতেন, "আল্লাহ্র নেক বান্দার অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছি।" ইবনে কুতাইবা দাইনূরী হযরত আলীর বিশেষত্ব ও ফজীলত বর্ণনায় এ ঘটনাটি এনেছেন। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে আনাস অভিশপ্ত হয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন সকলেই দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেও তিন ব্যক্তি তা করে নি। তারা আলীর অভিশাপে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আবু তুফাইল বলেন, "আমি যখন রাহ্‌বা হতে বের হয়ে আসি আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কিরূপে এ উম্মতের অধিকাংশ মানুষ রাসূলের এ নির্দেশের ওপর আমল করে নি? তাই যাইদ ইবনে আরকামের নিকট গিয়ে বললাম ঃ আলী এরূপ বলছিল ও দাবী করছিল। যাইদ বললেন ঃ এতে অস্বীকার করার কিছু নেই, আমি নিজেও নবী (সাঃ) হতে তা শুনেছি।

যদি এই ত্রিশ ব্যক্তির সঙ্গে স্বয়ং আলী ও যাইদ ইবনে আরকামকে যোগ করেন তবে মোট রাবীর সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ জন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা হতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "রাহ্‌বার ঘটনার দিন আলীকে দেখলাম লোকদের কসম দিয়ে বলছেন কেবল তারাই দাঁড়াও ও সাক্ষ্য দাও যার রাসূলকে সে অবস্থায় দেখেছ।"

আবদুর রহমান বলেন, "বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বার জন সাহাবী দাঁড়ালেন, যেন আমি এখনও তাঁদের বলতে দেখছি ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি গাদীরে খুমে ঐ দিন নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখি না? সবাই বলল ঃ হ্যাঁ। রাসূল বললেন ঃ আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ! আলীর বন্ধুর প্রতি আপনি ভালবাসা ও তার শত্রুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করুন।

ইমাম আহমদ একই পৃষ্ঠায় অপর একটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ভালবাস এবং শত্রুতা পোষণকারীদের শত্রু গণ্য কর। তার সাহায্যকারীদের তুমি সাহায্য কর এবং বিরোধিদের হতাশ ও লাঞ্ছিত কর।" উক্ত সাহাবীরা রাসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে এটি বলেন এবং তিন ব্যক্তি গাদীরে খুমে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও না দাঁড়ানোর কারণে আলী তাদের অভিসম্পাত করেন ও তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে– যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বার জন বদরী সাহাবীর সঙ্গে বদরী সাহাবী হিসাবে আলী ও যাইদ ইবনে আরকামকে যোগ করলে তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দ জন অর্থাৎ চৌদ্দ জন বদরী সাহাবী হাদীসটি

বর্ণনা করেছেন। রাহ্‌বা'র হাদীসটির বিষয়ে কেউ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে হাদীসটি প্রচারের জন্য আলী (আঃ) কিরূপ প্রজ্ঞাজনোচিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

৫। শহীদদের নেতা আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইন (আঃ) মুয়াবিয়ার শাসনামলে তাঁর পিতার রাহ্‌বা'র ঘটনার মত আরাফার ময়দানে হজ্বের সময় লোকদের সমবেত করেন ও প্রথমে তাঁর নানা, পিতা-মাতা ও ভ্রাতার প্রশংসা করার পর গাদীরের হাদীস বর্ণনা করে অন্যদের হতে স্বীকৃতি নেন। তাঁর মত একজন বাগ্মী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যাঁর কথা মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়কে আবেশিত করে অন্যকে নিজের অধীন করে, জনতা ইতোপূর্বে তা প্রত্যক্ষ করে নি। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রয়োজনীয় যুক্তি প্রদর্শন করে অন্যদের হৃদয়ে তা প্রতিস্থাপন করে গাদীর দিবসের হক্ব আদায় করেন। এরূপ স্থানে গাদীরের হাদীসের বর্ণনার প্রভাব খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল।

৬। ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর বংশধারার নয়জন প্রসিদ্ধ ইমামও হাদীসের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আপনারা আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সমগ্র সত্তা দিয়ে তা অনুভব করতে পারবেন যে, এই মহান ব্যক্তিবর্গ প্রতিবছর ১৮ জিলহজ্ব (গাদীর দিবসে) আনন্দ করতেন, সবাইকে মোবারকবাদ জানাতেন এবং ঈদ হিসেবে পালন করতেন। এ দিনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখতেন, নফল নামায ও দোয়া পড়তেন। এ দিন মহান আল্লাহ্‌ তাঁদের যে নিয়ামত দান করেছেন তাঁরা সে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এভাবে আদায় করতেন। কারণ এ দিনেই নবী (সাঃ)-এর মুখনিসৃত পবিত্র বাণীর মাধ্যমে আলী (আঃ)-এর ইমামত ও খেলাফত ঘোষিত হয়েছিল। এ ছাড়া এ দিনে তাঁরা নিকটাত্মীয়দের অধিক খোঁজ-খবর নিতেন ও তাদের বিভিন্ন উপহার দিতেন। তাঁদের অনুসারীদেরও তদ্রূপ করার উপদেশ দিতেন। এভাবেই গাদীরের ঘটনা বংশ পরম্পরায় টিকে রয়েছে।

৭। এর উপর ভিত্তি করেই শিয়ারা সকল যুগে সকল গ্রাম-শহর, দেশ ও স্থানে ১৮ই জিলহজ্ব ঈদ পালন করে আসছে। এ দিন শিয়ারা আল্লাহ্‌র

শোকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে (এজন্য যে আল্লাহ্ আমীরুল মুমিনীন আলীর ইমামতের ঘোষণার মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণতা দান এবং নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন) মসজিদসমূহে নফল নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হন। এ দিন তাঁরা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের খাদ্য দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টায় ব্রত হন। সম্ভব হলে প্রতি বছর এই দিন হযরত আলী (আঃ)-এর মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নাজাফে তাঁর কবরে যান। ১৮ই জিলহজ্ব হযরত আলীর কবর যিয়ারতকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে থাকে। অনেকেই এ দিনে মুস্তাহাব রোযা রাখেন। যিয়ারতকারীরা সেখানে সাদকা, নজর প্রভৃতি দান করেন এবং ইমামদের হতে নির্দেশিত যিয়ারতসমূহ সেখানে পাঠ করেন। এ যিয়ারতসমূহে আলীর বিভিন্ন ফজীলত যেমন দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অসীম কষ্ট স্বীকার, শ্রেষ্ঠ রাসূলের সেবায় তাঁর আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগের বিবরণ, রাসূলের পক্ষ হতে তাঁকে মনোনয়নের হাদীসসমূহ বিশেষত গাদীরে খুমের হাদীস প্রভৃতি বিষয় উদ্ধৃত করা হয়। বক্তারা এ দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন (মুরসাল) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত গাদীরের হাদীস এবং এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতাসমূহ পাঠ করে থাকেন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে গাদীর শি'আদের মাঝে পালিত হয়ে আসছে।

কবিতা সমূহ থেকে কিছু কবিতা এখানে পেশ করা হল ঃ

ويوم الدوح دوح غدير خم

খুমের জলাশয়ের বৃক্ষের পাশে সমবেত হবার দিবসে

أبان له الولاية لو أطيعا ...

তিনি (রাসূল) তাঁর (আলীর) বেলায়েতের ঘোষণা দিলেন প্রকাশ্যে, হায়! যদি তা মানা হত...

ويوم الغدير استوضح الحق اهله

গাদীর দিবসে সত্যপন্থী সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছে

بفيحاء ما فيها حجاب ولاستر

কোন প্রকার পর্দা ও অন্তরায় ব্যতিরেকেই যেন আলোকিতরূপে ॥

أقام رسول الله يدعوهم بها

রাসূল আহ্বান জানালেন যাত্রা বিরতি করে

ليقربهم عرف ويناهم نكر

যেন তারা কল্যাণের নিকটবর্তী হয় ও অকল্যাণ হতে নিরাপদ থাকে ॥

يمد بضبعيه و يعلم آنه

তাঁর (আলীর) হাত উঁচিয়ে করলেন ঘোষণা

وليّ و مولاكم فهل لكم خبر؟

সে তোমাদের মাওলা জেনেছ কি তা?

يروح و يغدو بالبيان لمعشر

তিনি (সাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা সকলের কাছে এ সত্যটি ব্যাখ্যা করেছেন ব্যাপক পরিসরে

يروح بهم غمر و يغدوبهم غمر

কিন্তু মূর্খতা তাদের নিয়ে গেছে রসাতলে ॥

فكان له جهر بإثبات حقّه

তিনি (সাঃ) তাঁর (আলীর) অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর ও দৃঢ়

وكان لهم فى برم حقّه جهر

আর তারা (জবর দখলকারী) তাঁর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ছিল কঠোর ॥

أثمّ جعلتم حظّه حد مرهف

অতঃপর সেদিন তোমরা কি তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে কর নি বঞ্চিত?

من البيض يومًا حظّ صاحبه القبر

যেদিন তাঁর বন্ধু (রাসূল) হলেন কবরস্থ ॥

সুতরাং আহ্‌লে বাইত ও শি'আ সূত্রে গাদীরে খুমের হাদীসটি মোতাওয়াতির হবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর দাবীদারদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নবী (সাঃ)-এর বাণীর প্রতিটি শব্দ যথাযথ সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছিল। এই সত্যকে যাচাই করতে চাইলে আপনি শিয়াদের নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত

চারটি গ্রন্থে তা দেখতে পারেন। তদুপরি শিয়া আলেমদের সংকলিত মুসনাদসমূহে এ হাদীস মুত্তাছিল[৬] ও মারফু[৭] সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কেউ এ বিষয়ে অধ্যয়ন করলে হাদীসটি শিয়া সূত্রে মোতাওয়াতির হবার বিষয়টি তার নিকট সুস্পষ্ট হবে।

৮। এমন কি প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতিতেই আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র সূত্রেও হাদীসটি মোতাওয়াতির বলে গণ্য হয়েছে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই এবং তাঁর দ্বীন অপরিবর্তনীয় (যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না) এ বাণীর ফলশ্রুতিতে বলা যায় গাদীরের হাদীস এ কারণেই সুন্নী সূত্রেও মোতাওয়াতির হয়েছে। 'ফাতওয়া আল হামিদিয়া' গ্রন্থের লেখক তাঁর 'আস্ সালাওয়াতুল ফাখিরাহ্ ফিল আহাদিনিল মুতওয়াতিরাহ্' নামক প্রবন্ধে এ হাদীসটিকে মোতাওয়াতির বলেছেন (তাঁর কট্টর মনোভাব সত্ত্বেও)। আল্লামা সুয়ূতি ও তাঁর মত অনেকেই হুযাইফাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারী (মুফাস্‌সির ও ঐতিহাসিক), আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে উকদা ও মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে ওসমান যাহাবী বিভিন্ন সূত্র হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কিত গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ইবনে জারির তাঁর বইয়ে পঁচাত্তরটি সূত্রে এবং ইবনে উকদা[৮] ১০৫টি

---

৬. যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েন নি অর্থাৎ সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ রয়েছে।

৭. যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে।

৮. 'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের লেখক তাঁর গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারির তাঁর 'আল বেলায়েত' গ্রন্থে ৯৫টি সূত্র হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে উকদাও ১০৫টি সূত্র উল্লেখ করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক মাগরেবী তাঁর 'আল ফাতহুল মুলকুল আলী বি সিহ্‌হাতি হাদীসি বাবি মাদিনাতিল ইলমে আলী' গ্রন্থে বলেছেন, "যাহাবী ও ইবনে উকদা গাদীরের হাদীস নিয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।"

সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর কট্টর মনোভাব সত্ত্বেও এ সকল সূত্রকে বিশুদ্ধ ও সহীহ্ বলতে বাধ্য হয়েছেন।[৯]

'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ে আহ্‌লে সুন্নাহ্ হতে ৮৯টি সূত্রে গাদীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিশেষত এ গ্রন্থে হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী, তাবরানী, বায্‌যার ইবনে ইয়ালী ও অন্যদের হতে উদ্ধৃত করেছেন।

সুয়ূতি তাঁর 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে হযরত আলী (আঃ)-এর জীবনীতে তিরমিযী হতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "আহমদ হাদীসটি আলী, আবু আইয়ুব আনসারী, যাইদ ইবনে আরকাম, উমর ও যিমার হতে বর্ণনা করেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "আবু হুরাইরা হতে আবু ইয়ালী এবং ইবনে উমর, মালিক ইবনে হুয়াইরিস, হাবশ ইবনে জুনাদা, জারির ইবনে আবদুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক হতে তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বায্‌যার, ইবনে আব্বাস, বুরাইদাহ্ ও আম্মারাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের পক্ষে আরেকটি দলিল হলো এ বর্ণনাটি যা ইমাম আহমদ তাঁর 'মুসনাদ' (৫ম খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে রিয়াহ ইবনে হারিস হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন- "একদল লোক আলীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ হে আমাদের মাওলা! আপনার ওপর সালাম! হযরত আলী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার অনুগত ব্যক্তি। হযরত আলী বললেন ঃ আমি তোমাদের মাওলা কিরূপে হলাম, তোমরা তো আরব। তারা বলল ঃ গাদীরের দিনে আমরা রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার মাওলা এই আলীও তার মাওলা।

রিয়াহ বলেন, "যখন তারা ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি তাদের অনুসরণ করলাম ও তাদের প্রশ্ন করলাম ঃ আপনারা কারা? তারা বলল ঃ আমরা মদীনার আনসার। তাদের মধ্যে আবু আইয়ুব আনসারীও ছিলেন।

---

৯. ইবনে হাজার তাঁর 'আস্‌সাওয়ায়িক গ্রন্থের ৫ম পাঠের ১ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি মোতাওয়াতির হবার পক্ষে অপর দলিল হলো এ হাদীস যা আবু ইসহাক সা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা মাআরিজের তাফসীরে দু'টি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "রাসূল (সাঃ) গাদীরের দিনে যখন জনগণকে সমবেত করে আলীর হাত ধরে ঘোষণা করলেন ঃ من كنت مولاه فعليّ مولاه তখন এ খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হারিস ইবনে নোমান ফেহ্‌রী তা শুনে উটে আরোহন করে রাসূলের নিকট আসল। উটকে বেঁধে রাসূলকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি একদিন নির্দেশ দিয়েছিলে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতে ও তোমাকে তাঁর নবী হিসেবে স্বীকার করতে, আমরা তা করেছি। পরবর্তীতে বললে দিনে পাঁচবার নামায পড়, তাও মানলাম, আবার বললে যাকাত দাও, তাও করলাম, পরে রমযান মাসের রোযা রাখার নির্দেশ দিলে, তাও শুনলাম, হজ্ব করার নির্দেশও পালন করলাম। এত কিছুতেও তোমার সন্তুষ্টি আসল না, অবশেষে নিজের চাচাত ভাইয়ের হাত ধরে তাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছ ঃ আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা- এ কথাটি তোমার নিজের পক্ষ হতে নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে? নবী (সাঃ) বললেন ঃ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি। হারিস তার বাহনের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ যা বলছে তা যদি সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান হতে পাথর বর্ষণ করুণ অথবা কোন কঠিন আজাব প্রেরণ করুন। তখনও সে তার বাহনের নিকট পৌঁছে নি, আকাশ হতে একটি বড় পাথর তার মাথার উপর আপতিত হয়ে তাকে ধ্বংস করল এবং মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করলেন- بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذى المعارج "এক ব্যক্তি চাইল, সেই আজাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত কাফিরদের জন্য। যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই তা এসেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিনি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী।" হাদীসটি আমরা হুবহু বর্ণনা করলাম।[১০] আহলে সুন্নাহ্‌র একদল হাদীস বেত্তা হাদীসটি বিনাবাক্যে গ্রহণ করেছেন।[১১]

---

১০. সা'লাবী আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র কয়েকজন মুহাদ্দিস ও রাবী যেমন আল্লামা শাবলানজী মিসরী হতে তাঁর 'নুরুল আবসার' গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনীতে হাদীসটি এনেছেন। পৃষ্ঠা ১১।

১১. হালাবী তাঁর 'সীরাহ্‌' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় বিদায় হজ্বের আলোচনায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

গাদীরের হাদীসের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা এবং মিথ্যা ও বিকৃতির আরেকটি নমুনা

ক. গাদীরের বিরুদ্ধবাদীরা হাদীসের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, 'সাহাবীদের আমলের কারণে আমরা গাদীরের হাদীসকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য, হোক তা মুতাওয়াতির বা অমুতাওয়াতির।' তাই আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র আলেমগণ বলেন, 'মাওলা' শব্দটি কোরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা হাদীদের ১৫ নং আয়াতে 'সঙ্গী' অর্থে এসেছে যেখানে কাফিরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে- مأواكم النّار هى مولاكم অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে তোমাদের আবাসস্থল ও তোমাদের উপযুক্ত সঙ্গী।

আবার সূরা মুহাম্মদের ১১ নং আয়াতে 'সাহায্যকারী' অর্থে এসেছে ও বলা হয়েছে- ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم অর্থাৎ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ সে সকল ব্যক্তির সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে এবং কাফিরদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

কখনো 'উত্তরাধিকারী' অর্থে 'মাওলা' ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা নিসার ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে- ولكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان والأقربون অর্থাৎ সকলের জন্যই আমরা উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের পিতা মাতা ও নিকটাত্মীয়রা ত্যাগ করে যায় এবং হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআনে বলছে, وإنّى خفت الموالي من ورائي "আমি আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের (স্বগোত্রের) ভয় পাই" (সূরা মারইয়াম: ৫) 'মাওলা' কখনো বা 'বন্ধু' অর্থে এসেছে, যেমন يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا "সেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কাজে আসবে না" (সূরা দুখান : ৪১)। অবশ্য 'ওয়ালী' (ولى) শব্দটি 'ক্ষমতার অধিকারী' বা 'দায়িত্বশীল' অর্থেও আসে, যেমন فلان وليّ القاصر অমুক ব্যক্তি অক্ষম বা বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত। তেমনি 'প্রিয়' অর্থেও 'ওয়ালী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চিন্তায় নবীর বক্তব্যের অর্থ হলো : আমি যার সাহায্যকারী, বন্ধু বা প্রিয় আলী তার বন্ধু, সাহায্যকারী ও প্রিয় এবং এ অর্থই পূণ্যবান খলীফা (রাঃ)) ও সাহাবীদের মতের অনুরূপ (من كنت ناصره أو صديقه أو حبيبه فإنّ عليّا كذلك)

খ. হাদীসও আমাদের যুক্তির সপক্ষে বলিষ্ঠ দলিল। হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তিবর্গ আলীর সঙ্গে ইয়েমেনে ছিলেন তাঁদের ওপর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলামী বিধানের কঠোরতা আরোপ করতেন। এ জন্য তাঁরা আলীর বিরুদ্ধে রাসূলের নিকট প্রতিবাদ করেন। এর জবাবেই রাসুল (সাঃ) গাদীরের দিনে আলীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন যাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁর অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের ভুল ভেঙ্গে যায়। প্রথমে রাসুল আলীর মর্যাদা ও পরে তাঁর আহ্‌লে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন যাতে তাঁদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

এ জন্য প্রথমে বলেছেন, "আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু" (من كنت وليّه فعليّ وليّه)। অতঃপর বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার আহ্‌লে বাইত" (إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي)

যেহেতু রাসূলের নিজের সম্মান আলীর সম্মানের সঙ্গে বিশেষভাবে এবং তাঁর পরিবারের সম্মানের সঙ্গে সাধারণভাবে জড়িত সেহেতু রাসূল সকল মানুষের উদ্দেশ্যে সেই সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের উপদেশ দিয়েছেন। তাই আহ্‌লে সুন্নাহ্ মনে করে এই হাদিসের মধ্যে খেলাফত বা নেতৃত্বের কোন নির্দেশনা নেই।

উপরের বিকৃত ব্যাখ্যার জবাব

সংক্ষিপ্ত জবাব ঃ

ক. গাদীরের হাদীসের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

খ. যে হাদীসটি গাদীরের ঘটনার প্রেক্ষাপটরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি মিথ্যা ও ঘটনাকে বিকৃত করার প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়।

বিস্তারিত জবাব ঃ

ক. আহলে সুন্নাহ্র আলেমগণ ব্যাখ্যা হিসেবে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আমাদের বিশ্বাস তাঁদের অনেকেরই মন সেটিতে সায় দেয় না বা বিশ্বাসও করে না। যেহেতু রাসূল (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে যাঁরা অবগত তাঁরা অন্তর হতে তা গ্রহণ করতে পারেন না। রাসূলের প্রজ্ঞা, নিষ্পাপত্ব ও সর্বশেষ নবী হিসেবে তাঁর পদক্ষেপ এ সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে। নবীকুল শিরোমণি ও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘোষণাকারী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- তিনি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছুই বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ বৈ কিছু নয়। তাঁকে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দান করেন (وما ينطق عن الهوي إن هو إلاّ وحي يوحى علّمه شديد القوى)

সুতরাং অন্য ধর্মের অনুসারী কোন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে কেন আপনাদের নবী (সাঃ) সেদিন সহস্র মানুষের যাত্রা বিরত করালেন? কেন গ্রীষ্মের ঐ প্রচণ্ড দাবদাহে ঊষর মরুভূমিতে তাদের থামার নির্দেশ দিলেন? কেন তিনি অগ্রগামীদের ফিরিয়ে আনার ও পশ্চাদ্গামীদের জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দান করলেন? উদ্ভিদহীন ও পানিশূন্য ঐ মরুভূমিতেই বা তাঁর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি? বিভক্তির ঐ পথের (গাদীর এমন একটি স্থান যেখান হতে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা পরস্পর বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ পথে যাত্রা করত) মাথায় দাঁড়িয়ে নিজের মৃত্যুর সংবাদ দান করার ও অনুপস্থিতদের নিকট এ বক্তব্য পৌঁছানোর আহ্বানই বা কোন্ উদ্দেশ্যে? তাঁর বিদায়ের সংবাদের সঙ্গে তাঁর দায়িত্বশীলতার বিষয়ের উল্লেখ করে কেনই বা বলেছেন : আমি এ বাণী সঠিকভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব? উম্মতই বা কোন্ বিষয়ে আনুগত্যের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে? কেনই বা একে একে আল্লাহ্র একত্বের,

নিজের নবুওয়াতের, বেহেশত, দোযখ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও কিয়ামতের বিষয়ে তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন? সকলের নিকট এগুলোর স্বীকারোক্তি গ্রহণের পদ্ধতিই বা কেন তিনি বেছে নিলেন? কেনই বা এসব প্রশ্নের পর আলীর হাত ধরে (এতটা উঁচু করলেন যে, তাঁর শুভ্র বগল দৃষ্টিগোচর হলো) ঘোষণা করলেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহ্ আমার অভিভাবক আর আমি মুমিনদের অভিভাবক' এবং 'মাওলা' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য মুমিনদের ওপর তাঁর অধিকারের বিষয়টিকে টেনে আনলেন ও বললেন, 'আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের হতে অধিকতর অধিকার রাখি না?' এরূপ ব্যাখ্যার পরেই বা কেন বললেন, 'আমি যার মাওলা এই আলী তার মাওলা' (من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه) এবং আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন, 'যে আলীকে ভালবাসে তাকে তুমি ভালবাস আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর। যে তাকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য কর আর যে তাকে অপদস্ত করে তুমিও তাকে অপদস্ত কর।'

কেন তিনি যে দোয়া কেবল আল্লাহ্র খলীফা ও ইমামদের জন্য প্রযোজ্য সেই দোয়া আলীর জন্য করলেন? কেনই বা মুমিনদের ওপর তাঁর নিজ অধিকারের বিষয়টি আনার পর তাদের স্বীকৃতি নিয়ে ঘোষণা করলেন : 'আমি যার মাওলা এই আলীও তার মাওলা' এবং কিসের ভিত্তিতেই বা আহলে বাইতকে কোরআনের সমকক্ষ বললেন এবং আলী (আঃ) ও আহ্লে বাইতের অভিভাবকত্বের বিষয়টিকে এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতের ঘোষণা দিলেন? প্রজ্ঞাবান এ নবীর এ বিষয়ে এত গুরুত্ব আরোপের কারণই বা কি? এরূপ বৃহৎ সমাবেশের আয়োজনের উদ্দেশ্যই বা কি? ياأيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته (হে রাসূল! আপনার ওপর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না

করেন তাহলে আপনি তাঁর রেসালতের কিছুই প্রচার করেন নি) এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ই বা কোন্ বাণী ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন যা পালন না করলে রাসূল (সাঃ) রেসালাতের কোন দায়িত্বই পালন করেন নি বলা হয়েছে? কেনই বা তিনি তাঁর রাসূলকে এ বিষয়ে এতটা উদ্বুদ্ধ করেছেন যা অনেকটা ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে? এটি কিরূপ দায়িত্ব ছিল যা পালনে রাসূল (সাঃ) ফিতনার ভয় পাচ্ছিলেন? আর এ কারণেই কি মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের হতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন?

অন্য মতবাদের কোন দার্শনিক আপনাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করলে আপনি কি এ জবাব দেবেন, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুসলমানদের সমবেত করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি ঘোষণা করবেন আলী তাঁদের সহযোগী ও বন্ধু। আমাদের বিশ্বাস হয় না আপনি এ জবাবে সন্তুষ্ট হবেন এবং এরূপ একটি সাদামাটা কর্মের দায়িত্ব মহান আল্লাহ যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং তাঁর নবী যিনি অন্য সকল নবীর নেতা ও প্রজ্ঞাবানদের সর্দার তাঁদের ওপর আরোপ করাকে যথেষ্ট মনে করবেন। আপনি (বিজ্ঞ পাঠক) এসবের উর্ধ্বে যে রাসূলের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করবেন যে, তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টাকে এমন কর্মে নিয়োজিত করবেন যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এবং সবার নিকট স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে আপনি বিশ্বাস করেন রাসূলের যে কোন কর্ম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ক্রটিপূর্ণ হতে পারে না এবং তাঁদের পক্ষে তাঁর কর্মের ভুল ধরাও অসম্ভব। বরং নবীর বাক্য ও কর্ম প্রজ্ঞাজনোচিত ও ভুলক্রটির উর্ধ্বে বলে তাঁকে আপনি নিষ্পাপ মনে করেন। স্বয়ং আল্লাহ্ সূরা তাকভীরে বলেছেন, "নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত রাসূলের বাণী। যিনি শক্তিশালী আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাশীল। সবার মান্যবর, বিশ্বাসভাজন এবং তোমাদের এ সঙ্গী (রাসূল) উন্মাদ নন।" মহান আল্লাহ্র এরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর তাঁকে কোন ক্রটির অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় কি বা তাঁর কর্মকে অসংলগ্ন প্রতিজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে কি? এমন সব প্রতিজ্ঞা ও যুক্তি যার মূল ঘটনার সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্টতাই নেই। আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল এরূপ বিষয়ের উর্ধ্বে। গাদীর দিবসে ঊষর ও উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে নবীর বাক্য ও কর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের নিমিত্তে অর্থাৎ তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা মনোনয়নের ঘোষণা দানের জন্যই এরূপ করেছিলেন। গাদীরের হাদীসের শাব্দিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংশ্লিষ্টতা হতেও এটি স্পষ্ট যে, নবী (সাঃ) তাঁর পরবর্তী নেতা হিসেবে আলীকে ঘোষণা করার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সুতরাং এ হাদীস এর পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের কারণে আলী (আঃ)-এর খেলাফতের পক্ষে অকাট্য দলিল যা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে কর্মে নিয়োজিত করবে এবং কর্ণ ও চক্ষুকে উন্মুক্ত করবে সে দেখতে পারে এরূপ ব্যাখ্যা হতে প্রত্যাবর্তনের কোন পথ নেই।

খ. কিন্তু হাদীসটিকে ব্যাখ্যার জন্য সহযোগী যে হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন এবং সত্যকে গোপন ও মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রনের মাধ্যমে একে বিকৃতির পোষাক পরানোর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ রাসূল (সাঃ) আলী (আঃ)-কে দু'বার ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। প্রথম বার অষ্টম হিজরীতে এবং এবারই নিন্দুকেরা আলীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় ও মদীনায় ফিরে রাসূলের নিকট অভিযোগ করে। নবী (সাঃ) এতে তাদের ওপর এতটা ক্ষুব্ধ হন যে, তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তারা আলীর বিষয়ে এরূপ কথা আর বলে নি (দ্র. আল-মুরাজায়াত)।

দ্বিতীয়বার যখন রাসূল (সাঃ) আলীকে ইয়েমেন প্রেরণ করেন (দশম হিজরীতে) তখন তিনি স্বয়ং আলীর হাতে পতাকা তুলে দেন ও নিজের পাগড়ী খুলে আলীর মাথায় বেঁধে দিয়ে বলেন, "যাত্রা কর। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিও না।" আলী (আঃ) রাসূলের নির্দেশ মত সকল দায়িত্ব পালন করে ফিরে বিদায় হজ্বে রাসূলের সঙ্গী হন ও তাঁর সঙ্গে হজ্বের নিয়ত করে ইহ্‌রামের পোষাক পরেন এবং হজ্বের সকল দায়িত্ব এক সঙ্গে সম্পাদন করেন। এমন কি রাসূল (সাঃ) তাঁর কুরবানীতে আলীকে শরীক করেন।

এইবার কেউই রাসূলের নিকট আলীর বিষয়ে অভিযোগ করে নি। সুতরাং

কিরূপে আমরা বলতে পারি গাদীরের হাদীস আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফলশ্রুতিতে বলা হয়েছে?

তদুপরি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণে নবী (সাঃ) সকলকেই যাত্রা বিরতি করিয়ে উটের পিঠে বসার সামগ্রীগুলো নামিয়ে মিম্বার তৈরী করার নির্দেশ দেবেন ও দীর্ঘক্ষণ তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করবেন এরূপ কথা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বলেই গণ্য হবে। এরূপ বিশ্বাস হতে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই যে, আমরা রাসূলের কাজকে অযথা ও অতিরঞ্জিত মনে করবো, কারণ তাঁর প্রজ্ঞা এ কর্মের অনুমতি দেয় না। মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসূল কর্তৃক আনীত এবং এটি কোন কবির বাণী নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর এবং এটি কোন অতীন্দ্রীয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটি বিশ্ব পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ" (সূরা আল হাক্কাহ্ ঃ ৪১-৪৩)। যদি রাসূল (সাঃ) চাইতেন (বিরোধিদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে) শুধু আলী (আঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে তবে তা এভাবে বলতে পারতেন– هذا ابن عمّي صهري و أبو ولدي وسيّد أهل بيتي فلا تؤذونني فيه অর্থাৎ সে (আলী) আমার চাচাতো ভাই, জামাতা, আমার সন্তানদের (দৌহিত্র) পিতা এবং আমার আহ্লে বাইতের নেতা সুতরাং তাকে কষ্ট দান কর না।

অথবা এরূপ কোন বাক্য যা রাসূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও মর্যাদা নির্দেশ করে। কিন্তু তা তিনি করেন নি, বরং হাদীসের শুরু এবং শেষে এমন কথা বলেছেন যা তাঁর নেতৃত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে বলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সর্বপ্রথম বলে।

এখন এরূপ বক্তব্য উপস্থাপনের কারণ যা-ই হোক বক্তব্যের শব্দ ও বাচনভঙ্গির প্রতি আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে।

তাছাড়া গাদীরের হাদীসে আহ্লে বাইতের স্মরণ আমাদের কথাকেই সমর্থন করে, কারণ আহ্লে বাইতকে তিনি কোরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করে জ্ঞানবানদের ইমাম বলে তাঁদের পরিচিত করিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

انی تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর তাহলে কখনো বিচ্যুত হবে না, তা হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহ্লে বাইত।"

তিনি এরূপ করেছেন যাতে উম্মত জানতে ও বুঝতে পারে রাসূলের পর দ্বীনের জন্য এ দু'য়ের ওপরই নির্ভর করতে হবে ও এ দু'য়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই আহ্লে বাইতের পবিত্র ইমামদের অনুসরণের অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তাঁদেরকে সেই কোরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে কোনক্রমেই বিচ্যুতি প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ্র কিতাবের পরিপন্থী নির্দেশের অনুসরণ যেমন বৈধ নয় তেমনি এমন কোন নেতা বা নেতৃত্বের অনুসরণও বৈধ নয় যারা আহ্লে বাইতের ইমামদের নির্দেশের পরিপন্থী নির্দেশ দান করে।

তাই রাসূলের এ কথা فإنّهما لن ينقضيا أو لن يتفرقا حتّي يردا عليّ الحوض। অর্থাৎ 'এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে'- এ হতে সুস্পষ্ট যে, রাসূলের ওফাতের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত কখনোই পৃথিবী কোরআনের সমকক্ষ আহ্লে বাইতের মধ্য হতে কোন ইমাম বিহীন হবে না। এ হাদীস হতে আরো বোঝা যায় খেলাফতও আহ্লে বাইতের বাইরে হতে পারবে না। এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে মুসনাদে আহমদের ৫ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

হযরত যাইদ ইবনে সাবিত রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন,

انی تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض
وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

"আমি তোমাদের মাঝে দুই খলীফা (প্রতিনিধি) রেখে যাচ্ছি আল্লাহ্র

কিতাব যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত এক রজ্জু এবং আমার আহ্‌লে বাইত। এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

এ হাদীসটিও আহ্‌লে বাইতের ইমামদের খেলাফতের সপক্ষে একটি অকাট্য দলিল। তাই হে সম্মানিত পাঠক! আপনি অবগত যে, আহ্‌লে বাইতের অনুসরণের অপরিহার্যতার দলিল হযরত আলীর অনুসরণের অপরিহার্যতা দান করে, কারণ আলী (আঃ) নিঃসন্দেহে রাসূলের আহ্‌লে বাইতের প্রধান।

তাই গাদীর ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস হতে বোঝা যায় এর কোনটিতে হযরত আলী আহ্‌লে বাইতের প্রধান হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ হতে কোরআনের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত আবার কোনটিতে নিজের ব্যক্তিত্বের কারণে রাসূলের মত মুমিনদের নেতা হিসেবে তাঁদের পক্ষ হতে ঘোষিত।

১৮ই জিলহজ্জ– একটি পবিত্র ঈদ-এর দিন

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্পাক রাসূলে করিম (সাঃ) এর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করিলে সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ১৮ই জিলহজ্জ তারিখে গাদীরে খুম নামক স্থানে হযরত আলী (কঃ)-কে মুসলমানদের মাওলা (শাসক, অভিভাবক) নির্ধারণের ঘোষণা করার পরক্ষণেই ইসলামের পূর্ণতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

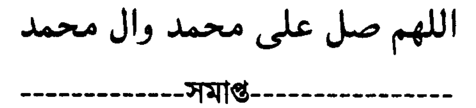
অর্থাৎ “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন হিসাবে 'ইসলামকে' পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের জন্য আমার সমস্ত নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করিলাম।” (সূরা মায়েদা, পারা ৬, আয়াত: ৩)

প্রকৃতপক্ষে ১৮ই জেলহজ্জ একটি পবিত্র দিন এবং গাদীরের ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই তারিখেই হযরত মুসা (আঃ) হযরত ইউশা (আঃ)-কে এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত আসেফ বিন বলখিয়াকে নিজ নিজ স্থালাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ)-ও ঐ একই তারিখে হযরত আলী (কঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়াগণও ঐ একই তারিখে তাঁদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন (জামে আব্বাসী, খন্ড- ২, পৃঃ ৫৮ দিল্লি হতে ১৩৩২ হিঃ মুদ্রিত)।

এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনটিকে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করেন। হযরত ওমরকে ঐ দিনের ফজিলত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সমস্ত প্রসংশা সেই রাব্বুল আলামিনের যিনি ১৮ই জেলহজ্জ আমাদের জন্য পবিত্র ঈদের দিন করিয়াছেন (তফসিরে দুররে

মানসুর, খন্ড-২, পৃঃ ২৫৮ মিসরে মুদ্রিত)। প্রসিদ্ধ কবি আবু তামাম গাদীরের বিস্তারিত বিবরণ তাহার কাসিদায় বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ইসলামী ইতিহাস সহ অন্যান্য গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে।

তাই আজও গাদীরের উপরোক্ত ঈদ উৎসবের ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান রাসূল ও রাসূলের আহলে বাইতের প্রেমিকগণ এই ঈদ উৎসবটি পালন করে আসছেন কখনো পারিবারিক ভাবে, কখনো সামাজিক ভাবে। তারা এই ১৮ই জিলহজ্জ তারিখটিকে বেলায়েত দিবস নামে, ঈদে গাদীর নামে, মাওলার অভিষেক নামে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন।



-------------সমাপ্ত----------------